দীন ধর্ম রিলিজিয়ন

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য্য

দীন ধর্ম রিলিজিয়ন

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য্য

ইসলামের উচ্চায় ও প্রতিষ্ঠায়
ইসলাম প্রচার সমিতি

ইপ্রস, ঢাকা

www.pathagar.com

ইপ্রস প্রকাশনা নং ঃ ১১

প্রকাশনায় ঃ
ইসলাম প্রচার সমিতি
১২৯, মিরপুর রোড,
কলাবাগান, ঢাকা—৫

প্রথম প্রকাশ ঃ
ডিসেম্বর, ১৯৮২ ইং
পৌষ, ১৩৮৯ বাং
রবিউল আওয়াল, ১৪০২ হিঃ

স্বত্ত্বাধিকারে ঃ
ইপ্রস, ঢাকা

মুদ্রণে ঃ
শতাব্দী প্রিন্টিং প্রেস
৩২/২, বি, কে, গাঙ্গুলী লেন,
(কায়েৎটুলী) ঢাকা—২

প্রচ্ছদে ঃ অংকন
২৫৩, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

মূল্য ঃ
সাদা—১০·০০
নিউজ—৮·০০ } টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান ঃ

○ আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শ্রীশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা—১

○ মদিনা পাবলিকেশন্স
১, প্যারিদাস রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা—১

○ শতাব্দী প্রকাশনী
৭১/এ, কাজী আলাউদ্দীন রোড,
ঢাকা—২

○ মিল্লাত লাইব্রেরী
২৫, নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা—১

○ প্রকাশনা বিভাগ
ইসলাম প্রচার সমিতি
১২৯, মিরপুর রোড,
কলাবাগান, ঢাকা-৫
ও
অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়

DEEN-DHORMO-RELIGION
(A Comparative Discussion about Deen, Dhormo & Religion)
By : ABUL HOSSAIN BHATTACHERJEE
Published by : Islam Prochar Somity.

Price : White—Tk. 10·00, News—Tk. 8·00 Only.

www.pathagar.com

প্রসঙ্গে

দীন, ধর্ম, রিলিজিয়ন। তিনটি ভাষার তিনটি শব্দ। তিনটি ইতিহাস। এই তিনটি পরিভাষার মধ্যে যেমন ভিন্নতা রয়েছে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে, ঠিক তেমনি ভিন্নতা রয়েছে বুৎপত্তিগত তাৎপর্যের দিক থেকেও। অথচ এই শব্দ তিনটিকে আমরা অবলীলাক্রমে একই অর্থে দীর্ঘদিন যাবত ব্যবহার করে চলেছি।

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মাওলানা আবুল হোসেন ভট্টাচার্য্য এই তিনটি শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন এ-গ্রন্থে। শুধু তাই নয়—তিনি এই তিনটি পরিভাষার তিনটি তাৎপর্য তথা মতবাদের গ্রহণ ও বর্জনের দিক-নির্দেশনাও করেছেন অত্যন্ত সুন্দর ও সার্থকভাবে। এ-গ্রন্থের দ্বারা অনুসন্ধিৎসুমহল যথেষ্ট উপকৃত হবেন বলে আশা করি।

ইসমাঈল হোসেন সিনাজী

১২৯, মিরপুর রোড, কলাবাগান, ঢাকা—৫
২২শে ডিসেম্বর '৮২

পরিচালক
প্রকাশনা বিভাগ
ইসলাম প্রচার সমিতি

www.pathagar.com

সূচীপত্র

০ পটভূমিকা ৯

০ ভাব ও ভাষা ২৫

০ ধর্ম শব্দের তাৎপর্য ৩৫

০ দীন (আদ্-দীন) শব্দের তাৎপর্য ৫০

০ দীন ও শরিয়ত ৬৪

০ রিলিজিয়ন ৭২

০ উপসংহার ৮৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দীন, ধর্ম ও রিলিজিয়ন

পটভূমিকা

বিগত ১৫ই ভাদ্র (১৩৯৮) তারিখের 'দৈনিক বাংলা' সংবাদ পত্রে '৮০ লক্ষ বছরের প্রাচীন চোয়াল' শিরোনামা দিয়ে একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে উক্ত সংবাদের উল্লেখযোগ্য অংশগুলো নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

"জাপানী বিজ্ঞানীরা আজ ৮০ লক্ষ বছর আগের একটি চোয়ালের অস্থি প্রদর্শন করেছেন। এই অস্থিটি 'এপ' মানব থেকে মানবে বিবর্তনের হারানো সূত্র খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।"

"এই চোয়ালটি গত শুক্রবারে কেনিয়ায় পাওয়া গেছে। কেনিয়ার মিউজিয়মের ডিরেক্টর রিচার্ড লিকি আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন—এই আবিষ্কার দারুণ সম্ভাবনাময়।"

"প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা যায় এই অস্থিটি প্রায় ৮০লক্ষ বছরের প্রাচীন। মানুষের জন্ম সম্পর্কে সাম্প্রতিক যে গবেষণা তাতে দেখা যায় পৃথিবীতে একেবারে প্রাথমিক স্তরের মানুষের পদ-চারণা ছিল চল্লিশ লক্ষ বছর আগে, তবে এই চল্লিশ ও এক কোটি কুড়িলক্ষ বছরের মধ্যবর্তী কালের সম্পর্কে কোন কিছুই জানা যায় নি।"

"৮০লক্ষ্য বছরের প্রাচীন এই অস্থিটি মানব ও 'এপ' মানবের ঠিক মধ্যবর্তী সময়কার।"

"আবিষ্কৃত চোয়ালটি মেয়ে গরিলার চোয়ালের মতো দেখতে, আকৃতিতেও মেয়ে গরিলার চোয়ালের মতো।"

এই সংবাদ বিবরণী থেকে যেসব তথ্য সর্বসম্যক্ষে দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে আমরা মনে করি মোটামুটিভাবে সেগুলি হলো ঃ

ক) সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ প্রাথমিক পরীক্ষার পরে চোয়ালটি যে ৮০ লক্ষ বছরের প্রাচীন সেকথা জানতে পেরেছেন।

www.pathagar.com

খ) ওটা দেখতে যে মেয়ে গরিলার চোয়ালের মতো এবং এই শ্রেণীর গরিলাই যে মানবজাতির আদিপুরুষ সঙ্গে সঙ্গে সে অভিমতও তাঁরা ব্যক্ত করেছেন।

বলাবাহুল্য, পরবর্তী কাজ দুটির একটি চোখে দেখে এবং অন্যটি অনুমানের সাহায্যে তাঁরা সমাধা করেছেন।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, চোয়ালটির প্রাচীনত্ব জানার জন্য পরীক্ষা করতে হয়েছে; অন্যথায় তা জানা সম্ভব ছিলনা। আর এ পরীক্ষাকে প্রাথমিক পরীক্ষা বলা হলেও ৮০ লক্ষ বছরের প্রাচীন কোন জিনিসের প্রাচীনত্ব নির্ণয়ের পরীক্ষাকে কোন ক্রমেই সহজ-সাধ্য বলা যেতে পারে না।

অথচ কোনরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে শুধু চোখে দেখেই ওটা যে কোন মেয়ে গরিলার চোয়ালের মতো সেকথা তাঁরা বলতে পারলেন। যদিও ৮০ লক্ষ বছরের প্রাচীন কোন জিনিস সম্পর্কে শুধু চোখে দেখাই যথেষ্ট নয়, তথাপি সেটাকে (চোখে দেখাকে) আমরা কোন কিছুকে জানার একটা উপায় বলে ধরে নিতে পারি।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, উক্ত চোয়ালটিকে মানব জাতির আদি পুরুষের চোয়াল বলে অভিমত দেয়ার মতো এমন একটা জটিল, গুরুত্বপূর্ণ, স্পর্শকাতর এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী কাজের বেলায় কোনরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সামান্যতম প্রয়োজনও তাঁরা অনুভব করলেন না।

তাঁদের এই অনুভব না করার কারণ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, শুধু সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা-ই নন, মানব জাতির জন্ম সূত্র জানতে আগ্রহী বিজ্ঞানীদের প্রায় সকলকেই গরিলা, বন-মানুষ, বানর, পিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাং প্রভৃতি জন্তু জানোয়ারদের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ফসিল চোখে পড়ার সাথে সাথেই ওটাকে মানবজাতির আদিপুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করতে দেখা যায়।

অবস্থা দৃষ্টে একথা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না যে, ওসব জন্তু জানোয়ারেরাই যে মানবজাতির আদিপুরুষ এমন একটা ধারণা বহু-

www.pathagar.com

কাল থেকেই তাঁদের মন মগজে এমন দৃঢ়ভাবেই বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে যে, ও নিয়ে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে বা থাকতে পারে সেকথা তাঁরা অনুভবই করেন না।

তাঁদের মন-মগজে এরূপ বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টির কারণ যে মিঃ ডারউইনের ক্রম বিবর্তনবাদের থিওরীর প্রতি গভীর বিশ্বাস শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই সেকথা জানা রয়েছে।

অথচ এই থিওরীর কোন সুদৃঢ় ও সুপরীক্ষিত ভিত্তি নেই—সবটাই রচিত হয়েছে নিছক আন্দাজ অনুমানের উপর ভিত্তি করে। তথাপি এই থিওরীর কিছুটা সারবত্তা স্বীকার করে নিলেও তার প্রতি আস্থা স্থাপন করা কোন ক্রমেই সম্ভব ও সঙ্গত হতে পারে না বলে আমরা মনে করি।

কেননা, এই থিওরী নিজেই যে আজও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর বা শৈশব অতিক্রম করতে সক্ষম হয় নি তার জাজ্বল্যমান বহু প্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে। অন্যান্য প্রমাণের দিকে না গিয়ে শুধু উদ্ধৃত সংবাদ বিবরণীটির দিকে লক্ষ্য করাই এজন্যে যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

গ) উক্ত সংবাদ বিবরণীতে বলা হয়েছেঃ "মানুষের জন্ম সম্পর্কে সাম্প্রতিক যে গবেষণা তাতে দেখা যায় পৃথিবীতে একেবারে প্রাথমিক স্তরের মানুষের পদ-চারণা দিল ৪০লক্ষ বছর আগে।'

এখানে 'মানুষের পদ-চারণা' বলা হলেও আসলে তা যে মানুষের তথাকথিত পূর্বপুরুষ অর্থাৎ পূর্বকথিত জন্তু-জানোয়ারদেরই পদ-চারণা সেকথা অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে।

শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানীদিগের কথানুযায়ী আপাততঃ যদি ঐসব জন্তু-জানোয়ারদেরকে মানবজাতির আদিপুরুষ বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে একথাও ধরে নিতে হয় যে, ৪০ লক্ষ বছর পূর্বে তারা এই পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল।

বলাবাহুল্য, ক্রমবিবর্তনবাদের থিওরী অনুযায়ী বহুসংখ্যক বিজ্ঞানী বহু বছর যাবত অবিরামভাবে চিন্তাগবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এই ৪০ লক্ষ বছরের হিসেব করেছিলেন এবং

www.pathagar.com

এটাকেই নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য বলে ধরে নিয়ে এর উপরেই অচল ও অটল ছিলেন।

নাইরোবিতে ৮০ লক্ষ বছরের প্রাচীন এই চোয়ালটি পাওয়ার ফলে তাঁদের এত কালের সাধনা এবং তার ফলাফলের প্রতি অচল ও অটল বিশ্বাস যে সম্পূর্ণরূপে বৃথা এবং পণ্ডশ্রমে পরিণত হলো সেকথা আর খুলে বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

ঘ) সংবাদ বিবরণীটির প্রথম দিকে বলা হয়েছেঃ "...এই অস্থিটি 'এপ' মানব থেকে মানবে বিবর্তনের হারানো সূত্র খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।"

এ থেকে অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, এত কালের যাবতীয় চিন্তাগবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা 'এপ' জাতীয় বানর পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। এপ মানব তথা এপ জাতীয় বানরেরা কিভাবে এবং কতদিনে আসল মানবে পরিণত হয়েছে সে-সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোন সূত্রই তাঁরা খুঁজে পান নি। এতদিন পরে ৮০ লক্ষ বছরের প্রাচীন এই চোয়ালটির সাহায্যে হয়তো সে সূত্রটি তাঁরা খুঁজে পাবেন না বলে আশা করছেন।

এখন প্রশ্ন হলোঃ এপ জাতীয় বানর পর্যন্তই যদি চিন্তা গবেষণাদি সীমাবদ্ধ থেকে থাকে এবং তারা কিভাবে এবং কতদিনে আসল মানবে পরিণত হলো প্রয়োজনীয় সূত্রের অভাবে তার চিন্তা গবেষণাদিই যদি চালানো সম্ভব না হয়ে থাকে তবে উক্ত বানর এবং উপরোক্ত জন্তু-জানোয়ারদেরকে মানব জাতির পূর্বপুরুষ বলে কেন এবং কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল ? আর সম্ভাব্য সকল উপায়ে সেই সিদ্ধান্তকে বিশ্ববাসীর উপরে জোর করে চাপিয়ে দেয়ার-ই বা উদ্দেশ্য কি ?

এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো এটাই হতে পারে যে, গোটা থিওরীটাই যেখানে ভিত্তিহীন এবং নিছক-আন্দাজ অনুমানের উপরে নির্ভর করে রচিত হয়েছে সেখানে তাকে ভিত্তি করে যে-গবেষণা তা-এর চেয়ে ভাল ফসল দিতে পারেনা।

ঙ) সংবাদ বিবরণীটির একস্থানে বলা হয়েছেঃ "এই চল্লিশ

www.pathagar.com

লক্ষ ও এক কোটি কুড়িলক্ষ বছরের মধ্যবর্তীকালের সম্পর্কে কোন কিছুই জানা যায় নি।"

এ থেকে সুস্পষ্টরূপেই বুঝতে পারা গেল যে, যে নাটকের সুদীর্ঘ ৮০ লক্ষ (১ কোটি ২০ লক্ষ—৪০ লক্ষ) বছরের অভিনয় সম্পূর্ণরূপে লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে গিয়েছে তাকে পূর্ণাঙ্গ নাটক বলে প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, অতএব এই প্রচারণাকেও কেউ যদি সেই অভিনয়েরই অংশ বলে ধরে নেয় তবে তাকে খুব বেশী দোষ দেয়া যায় না।

চ) উক্ত সংবাদ বিবরণীটিতে অতঃপর বলা হয়েছেঃ "৮০ লক্ষ বছরের প্রাচীন এই অস্থিটি মানব ও এপ মানবের ঠিক মধ্যবর্তী সময়কার।"

প্রাথমিক পরীক্ষার পরে চোয়ালটিকে ৮০ লক্ষ বছরের প্রাচীন বলে জানতে পারার কথা সংবাদ বিবরণীটিতে বলা হয়েছে। আর কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বলা হয় নি।

অতএব এই অস্থি বা চোয়ালটিকে 'মানব ও এপ মানবের ঠিক মধ্যবর্তী সময়কার' বলে যে-মন্তব্য করা হয়েছে তা নিশ্চিত রূপেই অনুমান প্রসূত, সুতরাং ভিত্তিহীন।

ছ) ৮০ লক্ষ বছরের প্রাচীন এই চোয়ালটিই যে মানব জাতির তথাকথিত পূর্বপুরুষদিগের শেষ নিদর্শন এবং অতঃপর পৃথিবীর কুত্রাপি এর চেয়ে প্রাচীন কোন নিদর্শন যে আবিষ্কৃত হবেনা সেকথা কেউ বলতে পারে না, সুতরাং এই পরীক্ষাই সর্বশেষ পরীক্ষা এবং এ থেকেই যে এ সম্পর্কীয় যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর ও যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে দৃঢ়তার সাথে সেকথা বলাও সম্ভব নয়। আর এমনটা হওয়া মোটেই বিচিত্র নয় যে, আবিষ্কার এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ কোন দিনই শেষ হবেনা। ফলে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও কোন দিনই সম্ভব হবেনা।

জ) এমনটা হওয়াও মোটেই বিচিত্র নয় যে, শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানীদিগের অভিপ্সিত নিদর্শনের আসল এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনটি বা নিদর্শনসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত অথবা এমন ভাবেই ভূগর্ভে

www.pathagar.com

প্রোথিত হয়ে গিয়েছে যে, তাকে উদ্ধার করা কোন দিনই সম্ভব হবেনা ফলে অভিপ্রেত লক্ষ্যে উপনীত হওয়াও কোন দিনই সম্ভব হয়ে উঠবে না।

পরিশেষে তথাকথিত 'ক্রমবিবর্তনবাদ' সম্পর্কে একটিমাত্র কথা বলেই এই প্রসঙ্গের ইতি টানছি।

এই 'বাদ' যদি সত্য হয় তবে তাকে যে অবশ্যই একটি প্রাকৃতিক নিয়ম হতে হবে সেকথা বলাই বাহুল্য। কথাটিকে আরো পরিষ্কার করে বললে বলতে হয়—বানর, গরিলা প্রভৃতিরা যদি সত্যি সত্যি মানুষে পরিণত হয়ে থাকে তবে নিশ্চিত রূপেই এ কাজ কোন অলৌকিক উপায়ে হয় নি বরং প্রাকৃতিক নিয়মেই সাধিত হয়েছে।

যেহেতু প্রাকৃতিক নিয়ম মানুষ এবং জন্তু-জানোয়ার নির্বিশেষে সকলের উপরে সমভাবে কার্যকর হয়ে থাকে অতএব প্রাকৃতিক নিয়ম হিসেবে ক্রমবিবর্তনের ধারাটিকেও সকলের উপরে সমভাবে কার্যকর হতে হবে। অন্যথায় তাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলা যাবে না।

অথচ ক্রমবিবর্তনবাদীরা শুধু বানর-গরিলা প্রভৃতিরই মানুষে পরিণত হওয়ার দাবী করে চলেছেন। বলাবাহুল্য, তাদের এই বাদ সত্য হলে অন্যান্য জীব জন্তুরাও নিশ্চিত রূপেই মানুষ না হলেও অন্য কোন উন্নততর জীবে পরিণত হতো। কিন্তু তা হয় নি। অন্যান্য জীব জন্তুরা যে আবহমান কাল যাবত সেই পশু পর্যায়েই রয়ে গিয়েছে তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ আমাদের চোখের সম্মুখেই রয়েছে।

অতএব এই প্রাকৃতিক নিয়ম শুধু বানর-গরিলা প্রভৃতিকেই সৃষ্টির সেরা মানুষে পরিণত করলো অন্য জীব-জন্তুদের সামান্য পরিবর্তন সাধনেও সক্ষম হলো না এমন উদ্ভট ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ কথা আমরা মেনে নিতে পারি না।

সবশেষে শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানীদিগের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ; আপনারা নিবিষ্ট মনে এবং ধৈর্য সহকারে আপনাদের গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরিক্ষার কাজ চালিয়ে যেতে থাকুন। অন্ততঃ মানব জাতির আদি পুরুষ নির্ধারণের মতো এমন একটি মহা গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

বিষয়ে সকল ধরনের গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ সম্পূর্ণরূপে সমাধা করতঃ সর্বশেষ, ও সত্যের কষ্টি-পাথরে যাঁচাই করা সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত কোন জন্তু-জানোয়ার বা অন্য কিছুকে মানব জাতির আদি পুরুষ বলে আর কোন মন্তব্য প্রকাশ করবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটিকেও বিশেষভাবে মনে রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি যে বিশ্বের প্রতিটি ধর্মগ্রন্থ যেখানে মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব বলে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে, যেখানে জ্ঞানীগুণী নির্বিশেষে বিশ্বের আপামর জনসাধারণ আবহমান কাল ধরে নিজদিগকে সৃষ্টির সেরা জীব বলে গভীরভাবে বিশ্বাস পোষণ করে চলেছে এবং যেখানে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব আজ সারাটি বিশ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেখানে কোন খোঁড়া যুক্তি বা আন্দাজ-অনুমান-নির্ভর কোন মতবাদ দিয়ে মানুষকে পশুর বংশধর প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা শুধু ধৃষ্টতারই শামিল নয়—পবিত্র ধর্ম-বিশ্বাসের মূলে প্রচন্ড কুঠারাঘাত এবং মানুষের মধ্যে হীনমন্যতা সৃষ্টি করতঃ তার মর্যাদা, উচ্চাভিলাস ও অগ্রগতির পথকে ধূলিসাৎ করে দেয়া। অতএব গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা না করে এ-কাজে হাত দেয়া ঠিক হবেনা।

আমাদের এই কথা থেকে কেউ যদি মনে করেন যে, আমরা বিজ্ঞানের অবদানকে অস্বীকার করছি বা খাটো করে দেখছি তবে তিনি প্রচণ্ড ভুল করবেন। এতক্ষণ আমরা শুধু একথাই বুঝাতে চেয়েছি যে, মানুষেরাই জ্ঞানী-বিজ্ঞানী হয় এবং যাবতীয় গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার-কাজও পরিচালিত হয় মানুষের দ্বারাই, অথচ কোন মানুষই ভুল ত্রুটির উর্ধে নয়।

সুতরাং চিন্তা গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রেও তার ভুল-ত্রুটি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় তাদের সকল আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও চিন্তাগবেষণার ফসলকে নির্বিচারে সত্য ও অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করা যেতে পারে না। বিজ্ঞানীরাও যে ভুল করেন তার জাজ্বল্যমান বহু প্রমাণ আমাদের কাছে রয়েছে। জন্তু-জানোয়ারকে মানুষ জাতির আদি পুরুষ সাব্যস্থ করাকেও আমরা তেমনি

www.pathagar.com

একটি ভুলপ্রমাদ বলে মনে করি। কেন করি অতঃপর সেকথাই বলা হবে।

জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদিগের প্রসঙ্গ ছেড়ে এবার আসুন আমাদের নিজেদের সহজ-সরল এবং বিশ্বাস-প্রবণ পরিবেশে ফিরে গিয়ে মানব-জাতির আদিম পরিচয় সম্পর্কে অবহিত হতে চেষ্টা করি।

অনেকেই হয়তো দীন (আদ্-দীন), ধর্ম ও রিলিজিয়ন শব্দের তাৎপর্য লিখতে বসে প্রসঙ্গবহির্ভূত মানব জাতির আদিম পরিচয় নিয়ে আমাকে তোলপাড় করতে দেখে বিরক্ত ও বিস্মিত হতে পারেন।

তাঁদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হচ্ছি যে, মানুষের জন্যেই দীন, ধর্ম বা রিলিজিয়নের প্রয়োজন। সেই মানুষেরাই যদি নিজদিগকে জন্তু-জানোয়ার বা অসভ্য বর্বরের বংশধর বলে মনে করে তবে দীন, ধর্ম বা রিলিজিয়ন-এর আর কোন প্রয়োজনই থাকেনা।

অতএব ওসব শব্দের তাৎপর্যকে তুলে ধরার পূর্বে মানুষ শব্দের তাৎপর্য বা মানুষেরা যে আসলেই মানুষ সেকথা তুলে ধরার সমধিক প্রয়োজন আমি বোধ করেছি। আশা করি বিষয়-টিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা হবে। অতঃপর আসুন আমাদের মূল বক্তব্যে ফিরে যাই ঃ

মানুষ যে, সৃষ্টির সেরা জীব সে-সম্পর্কে আজ আর দ্বিমতের কোন অবকাশই নেই। আর সেরা জীব হওয়ার জন্যে সেরা গুণ থাকা যে অপরিহার্য সেসম্পর্কেও কোন দ্বিমত থাকতে পারেনা।

আমরা জানি প্রজ্ঞা, প্রতিভা, ধীশক্তি, ভাল মন্দের পার্থক্য বোধ, জ্ঞান বুদ্ধি-বিবেচনা, মননশীলতা প্রভৃতি সেরা গুণসমূহ মানুষকে শুধু অন্য জীব থেকে পৃথকই করে নি সৃষ্টির সেরা হিসেবে সক-লের উপরে আসন প্রতিষ্ঠার যোগ্য এবং অধিকারীও করেছে। অথচ এগুলি আপনাপনি এসে কারো মাঝে উপনীত হয় না; সংগ্রাম ও সাধানার সাহায্যে অর্জন করে নিতে হয়।

www.pathagar.com

বলাবাহুল্য, এই অর্জন এবং সংগ্রাম ও সাধনার উপযোগী উপকরণ, উপাদান ও সুযোগ সুবিধাসমূহ দ্বারা তাকে সমৃদ্ধও করা হয়েছে। যেহেতু একমাত্র মানুষ ব্যতীত অন্য কোন জীব বা জন্তু-জানোয়ারদেরকে এসবের দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয় নি অতএব আবহমান কাল যাবত তারা একই পর্যায়ে পড়ে রয়েছে। পক্ষান্তরে মানুষ নিজেকে সৃষ্টির সেরা জীবরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

যেহেতু কোন জন্তু-জানোয়ারকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের অনুকূল উপকরণ উপাদান এবং সুযোগ সুবিধাসমূহ দিয়ে সৃষ্টিই করা হয় নি অতএব ক্রমবিবর্তন বা অন্য কোনভাবে তাদের মানবে পরিণত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব হতে পারেনা।

বলাবাহুল্য, মানুষ এবং জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে এমনি ধরনের অনেক পার্থক্যই রয়েছে। এখানে তার দুটি মাত্রকে তুলে ধরে প্রসঙ্গের ইতি টানছি।

পশু বা অন্য কোন জীবের আত্মা আছে কিনা আমরা জানিনা, জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরাও সেসম্পর্কে নীরব। অথচ মানুষের আত্মা আছে এবং আত্মা আছে বলে আত্মীয় আছে, আত্মীয়তা-বোধও আছে।

মা-বাবা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, খালা-ফুফু, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি কার সাথে কি ব্যবহার করতে হয় মানুষ তা জানে এবং নিষ্ঠার সাথে তা মেনে চলে। পক্ষান্তরে পশুদের আত্মীয় নেই আত্মীয়তা-বোধ নেই, ব্যবহার বিধি মেনে চলার বালাইও নেই।

উদাহরণ দিয়ে বললে বলতে হয়, পশুদের মতো মানুষদেরও যৌনবোধ এবং যৌন উত্তেজনা রয়েছে, কিন্তু মানুষের সংযম আছে গম্য-অগম্য বোধও আছে। পশুদের তা নেই, ফলে উত্তেজনা সৃষ্টির সাথে সাথেই তারা মা, বোন, কন্যা, নানী, চাচী প্রভৃতি যাকে কাছে পায়, তার সাথেই মিলিত হয়।

www.pathagar.com

আমাদের কথিত অন্য পার্থক্যটি হলো ঃ মানুষ একটি নীতিবোধ সম্পন্ন জীব। সে চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনাকরতঃ নীতিমালা, আইন-কানুন, বিধি-বিধান প্রভৃতি রচনা করতে পারে এবং মেনেও চলতে পারে। কিন্তু পশুদের নীতিবোধ নেই, নীতিমালা, আইন, কানুন এবং বিধি-বিধান রচনার সাধ্যও নেই, তা মেনে চলার প্রশ্নও নেই। ভাল-মন্দ, নীতি-দুর্নীতি বলতে কি বোঝায় তারা তা জানেনা মানেও না। ফলে সহজাত আবেগে অন্ধের মতো তাদেরকে পরিচালিত হতে হয়।

কোন পশু, জন্তু-জানোয়ার বা কোন জীবের পক্ষে মানুষে পরিণত হওয়া যে সম্ভবই নয়, এই সব প্রত্যক্ষ ও বাস্তব পার্থক্যসমূহ থেকে তা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং ক্রম-বিবর্তন বাদ-এর থিওরী মেনে চলা এবং বানর, গরিলা, বন মানুষ, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতিকে মানব জাতির আদি পুরুষ বলে স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভবই হতে পারেনা।

এবারে আসুন, এই পুস্তকে 'ধর্ম শব্দের তাৎপর্য' শীর্ষক আলোচনার শেষভাগে উল্লেখিত *Paganism* শব্দটির তাৎপর্য নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি।

শ্রদ্ধেয় নৃবিজ্ঞানী, প্রাণীতত্ত্ববিদ, পুরাতত্ত্ববিদ প্রভৃতিরা প্রায় সকলেরই অভিমত হলোঃ

"আদিম মানুষেরা *Pagan* বা অসভ্য বর্বর ছিল। প্রকৃত পক্ষে সেদিন পশু এবং মানুষের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিলনা। বর্বরযুগ, প্রচীন প্রস্তরযুগ, নতুন প্রস্তরযুগ, লৌহযুগ প্রভৃতি স্তর বা পর্যায় গুলি অতিক্রম করতে করতে মানুষ আজ আনবিক যুগে পদার্পণ করেছে।"

বলতে গেলে তাঁদের এই চিন্তাধারা বা মতবাদ আজ সর্বজন স্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়েছে। এর বিরুদ্ধে কোন কথা উচ্চারণ করার সাথে সাথে উচ্চারণকারীকে নানাভাবে নাজেহাল হতে হয়।

পৃথিবীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মেলা, প্রদর্শনী, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতির মাধ্যমে অন্যকথায় সম্ভাব্য সকল উপায়ে এই

www.pathagar.com

মতবাদ-কে সর্বসাধারণ বিশেষ করে তরুণ সমাজের মনমগজে বদ্ধমূল করে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বলতে গেলে এই মতবাদের সত্যতাকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়ে তার ভিত্তির উপরেই আধুনিক সভ্যতাকে গড়ে তোলা হয়েছে। আধুনিক সভ্যজগতের প্রায় সর্বজন স্বীকৃত এই মতবাদ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করার প্রয়োজনই হতোনা যদি না এটা আবহমান কালের লক্ষ কোটি জনতার ধর্ম-বিশ্বাসের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াতো।

দুঃখের বিষয়, এই মতবাদের অনুসারীদিগের মতে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ, মহাপুরুষদিগের এ-সম্পর্কীয় অভিমত এবং আবহমান কালের ধর্ম-বিশ্বাস আজ মিথ্যা, অলীক, সেকেলে এবং বর্বরযুগীয় চিন্তাধারার ফসল ছাড়া আর কিছুই নয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যবুর, তওরাত, ইঞ্জিল, কোরআন প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের প্রত্যেকটিতেই মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-কে নবী বলা হয়েছে। সেই আদিম যুগেই তাঁর বংশধরদিগের অনেকেই নবী ছিলেন বলে জানা যায়। অসভ্য বর্বর হলে তাঁরা যে নবীর মর্যাদা পেতেন না সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

হিন্দুধর্ম-গ্রন্থেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, ইন্দ্র, বরুণ, যম প্রভৃতিরা কেউবা সৃষ্টিকর্তা, কেউবা ভগবান, আর কেউবা প্রখ্যাত দেবতা ছিলেন বলে বলা হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে এঁদের চরিত্র এবং কার্যকলাপের যেসব বিবরণ রয়েছে তা থেকে এঁরা যে অসভ্য বর্বর ছিলেন কোনক্রমেই সেকথা বলা যেতে পারে না।[১]

---

১. যবুর, তওরাত, ইঞ্জিল, এবং কোরআনে হযরত আদম (আঃ)-কে আদি পিতা বলা হয়েছে। কারণ তিনি যেসব সন্তান সন্ততির জন্ম দিয়েছিলেন বিশ্বের সকল মানুষ তাদেরই বংশধর।

পক্ষান্তরে হিন্দুশাস্ত্রসমূহেও সেই একই কারণে ব্রহ্মাকে আদি পিতা না বলে সৃষ্টিকর্তা বলা হয়েছে। হযরত আদম (আঃ) এবং ব্রহ্মা যে একই ব্যক্তি তার অন্য একটি প্রমাণ হলো—হযরত আদম (আঃ)-এর পাঞ্জরাস্থি দিয়ে তাঁর

www.pathagar.com

যবুর, তওরাত, ইঞ্জিল, এবং কোরআনের বর্ণনানুযায়ী আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টির সেরা এবং তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন বলে জানা যায়। তিনি কতগুলি অসভ্য বর্বরকে সৃষ্টির সেরা এবং নিজের প্রতিনিধি বলে আখ্যা দেবেন একথা কেউ বিশ্বাস করতে পারে না।

হিন্দুদিগের ধর্মগ্রন্থসমূহে প্রতিনিধি না বলে ভগবান, দেবতা, অতিমানব, মহামানব প্রভৃতি বলা হয়েছে। কোন অসভ্য বর্বর যে এসব আখ্যা পেতে পারেনা সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে, উল্লিখিত ধর্মগ্রন্থসমূহ বিভিন্ন সময়ে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবতীর্ণ বা রচিত হয়েছে। এই সময়ের এবং দেশের ব্যবধান এত বেশী যে উক্ত গ্রন্থসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট মহাপুরুষদিগের পরস্পরের সাক্ষাৎকার বা একে অপরের সাথে ভাবের আদান-প্রদানের কোন সুযোগই ছিলনা।

সহধর্মিনী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছিল বলে উপরোল্লেখিত ধর্মশাস্ত্র-সমূহে বলা হয়েছে।

পক্ষান্তরে হিন্দুশাস্ত্রসমূহে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মা তার শরীরের অর্ধেক অংশকে নারীতে পরিণত করেছিলেন, এই নারীর নাম শতরূপা, সাবিত্রী, গায়ত্রী প্রভৃতি।

এ নিয়ে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রকৃত অবস্থাটা এখানে তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে বলে বোধ করছি। বায়ুপুরাণে বলা হয়েছে ঃ

ততঃ স্বদেহ সম্ভূতা মাত্মজা
মিত্য কল্পয়ৎ
... ...
সাবিত্রীং লোক সৃষ্টার্থং
হৃদি কৃত্তা সমস্থিতা ঃ

অর্থাৎ-নিজের দেহ থেকে উৎপন্ন হওয়ার কারণে উক্ত নারীকে আত্মজা বা কন্যা বলে কল্পনা করা হয়েছিল এবং লোক সৃষ্টির জন্য অন্য রমনীর অভাব হেতু সেই কন্যা বা সাবিত্রীকেই স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা (হৃদয়ে স্থান দেয়া)হয়েছিল।

ভুলটা এখানেই; দেহ থেকে উৎপন্ন হলেও কন্যা বা আত্মজাকে যেভাবে জন্ম দেয়া হয় সাবিত্রীকে সেভাবে জন্ম দেয়া হয় নি। সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে

www.pathagar.com

অতএব তাঁরা যে, একে অপরের সাথে পরামর্শ করে একইরূপ কথা নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন কোন ক্রমেই সেকথা মনে করা যেতে পারে না।

Paganism-এ বিশ্বাসী ব্যক্তিরা হয়তো-তাঁদের কথার সমর্থনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলির প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করতঃ বলতে পারেন—"এই সব উপজাতীয়-দিগকে দেখুন এবং এদের ইতিহাস জানতে চেষ্টা করুন তা হলেই এরা যে, আমাদের কথিত সেই বর্বরযুগের প্রতিনিধিত্ব করছে সেকথা বুঝতে পারবেন"।

Paganism-এ বিশ্বাসী ব্যক্তিদিগের সাথে এ সম্পর্কে আমাদের কোন মত পার্থক্য নেই। কিন্তু তাই বলে আমরা বিশ্বের ধর্মগ্রন্থ-সমূহকে এবং আবহমান কালের ধর্ম-বিশ্বাসকে মিথ্যা, অলীক প্রভৃতি বলতে কোন ক্রমেই রাজী হতে পারি না। বলাবাহুল্য, তাঁদের সাথে আমাদের মত পার্থক্য এখানেই।

অনেকেই হয়তো আমাদের একথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হয়ে প্রশ্ন করবেন—*Paganism*-এ বিশ্বাসী হয়ে আবার ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের সত্যতায় বিশ্বাসী হওয়া কিরূপে সম্ভব ?

অঙ্গের অর্ধাংশ থেকে সৃষ্টি করা হয়ে ছিল অতএব তাকে অর্ধাঙ্গিনী বলাই যুক্তি সঙ্গত। অথচ শাস্ত্রকর্তা তাকে কন্যা বা আত্মজা বলেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য শাস্ত্রে ও স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গিনী বলা হয়ে থাকে। এখানে অর্ধাঙ্গিনী না বলে কন্যা বা আত্মজা বলার কারণেই পিতা এবং কন্যার মিলনজাত সন্তানদিগকে অবৈধ বলা হয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে এ নিয়ে সমাজে বিশৃংখলা দেখা দেয়ায় তদানিন্তন শাস্ত্র কর্তাগণ প্রথম মনুর পূর্ব পর্যন্ত ব্রহ্মার সন্তানদিগকে "দেবতা" আখ্যা প্রদান করেন এবং মনুপরবর্তী সকলকে 'মানব" রূপে আখ্যায়ীত করার নীতি গ্রহণ করেন। উপরোক্ত বিশৃংখলা এড়ানোর জন্য ঘোষণা করা হয় যে "দেবতার কার্য মানুষ বা মানবের বিচার্য হ'তে পারে না।"

পক্ষান্তরে যবুর, তওরাত, ইঞ্জিল এবং কোরআনে হাওয়াকে হযরত আদম (আঃ)-এর জওজ বা অর্ধাঙ্গীনি বলা হয়েছে। ফলে উৎপন্ন সন্তানদিগের বৈধতা নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠে নি।

www.pathagar.com

এই প্রশ্নের উত্তর হলো—সম্ভব বলেই আমরা উভয়টাই বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি যে, আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরেরা সভ্য মানুষই ছিলেন। বংশ বৃদ্ধির ফলে খাদ্যাভাব, পশুচারণ ভূমির অভাব প্রভৃতি নানা অসুবিধা দেখা দেয়। আদম বংশধরেরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

মূল কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্থানীয় পরিবেশ, জীবন সংগ্রামের কঠোরতা প্রভৃতি কারণে এই ছড়িয়ে পড়া দলগুলির মধ্যে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতির সৃষ্টি হতে থাকে, দিনে দিনে তা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে, তারা অসভ্য বর্বরে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে মূল কেন্দ্রে অবস্থানকারীগণ এবং কেন্দ্রের সাথে যাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল তারা সভ্যই থেকে যায়। বলাবাহুল্য, আধুনিক সভ্যতার গোড়াপত্তন এদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল।

আজ আমরা এবং উপজাতীয়রা যেমন একই দেশের বাসিন্দা হয়েও সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা উন্নতি অগ্রগতি প্রভৃতির বেলায় বলতে গেলে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে রয়েছি। সুদূর অতীতের অবস্থাও ঠিক এমনই ছিল বলে আমরা বিশ্বাস করি।

তবে বলে রাখা ভালো যে, আমাদের কথিত এই সভ্য মানুষেরা এক একজন বিরাট ধরনের পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, রকেট, স্পুটনিক প্রভৃতি এবং বিরাট বিরাট কলকারখানা নির্মাণ করেছিলেন সেকথা আমরা বলিনা, বিশ্বাসও করিনা। সভ্যমানুষ বলতে আমরা আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, আদান-প্রদান, কথা-বার্তা, চিন্তা-মনন-শীলতা প্রভৃতিতে যারা সংযত সংহত এমন মানুষদিগকেই বুঝাতে চাচ্ছি।

পক্ষান্তরে, যারা চরম আধুনিকতা এবং চরম উন্নতির দাবীদার হয়েও নির্দোষ নিরপরাধ কোটি কোটি মানুষের উপরে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়, শহরের পর শহরকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে, শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন নিষ্পেষণে কোটি কোটি মানুষকে নিঃস্ব

www.pathagar.com

কংকালে পরিণত ও দম্ভ-অহংকারে ধরাকে সরাজ্ঞান করে তাদিগকেই আমরা চরম অসভ্যও চরম বর্বর বলি, তাদের সম্পর্কে অপরিসীম ঘৃণাও পোষণ করি।

আদি মানবেরা যে, অসভ্য বর্বর ছিলনা এবং তাদিগকে অসভ্য বর্বর বলাটা যে, বিরাট একটা ভুল সেসম্পর্কে আর দুটি কথা বলেই প্রসঙ্গের ইতি টানছি।

আজ আমরা যাদিগকে অসভ্য বর্বর বলছি যদি তাদের ফিরে আসা সম্ভব হতো তবে তারা ফিরে এসে বলতো—হে আমাদের মতো অসভ্য বর্বরদিগের সুসভ্য এবং অবর্বর সন্তানেরা! তোমরা যে লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ কর সে লাঙ্গলের উদ্ভাবন ও জমি চাষের পদ্ধতি আমাদেরই উদ্ভাবিত. এখন তোমরা সভ্য শিক্ষিত হয়েছ. অতএব লাঙ্গলের ব্যবহার ও জমি চাষের পদ্ধতি ঘৃণা ভরে পরিত্যাগ করতঃ বিনা লাঙ্গলে এবং বিনাচাষে ফসল ফলানোর উপায় উদ্ভাবন করে নাও।

গৃহনির্মাণ. পশুপালন, শত্রুর মোকাবিলার জন্য অস্ত্রের ব্যবহার, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র. রান্না করে খাওয়া প্রভৃতিও আমাদেরই উদ্ভাবিত. অতএব খবরদার! এ সবের ব্যবহার তোমরা করতে পারবেনা। জীবনধারন ও সংসার যাত্রানির্বাহের জন্য তোমরা অন্য পন্থা অবলম্বন কর।

হে আমাদের পিতৃনিন্দুক পুত্রগণ! তোমাদের এই আধুনিক সভ্যতার গোড়ায় আমাদের মতো অসভ্য বর্বরদিগের আর কি কি অবদান রয়েছে তার অনুসন্ধান কর এবং এহেন বর্বরদিগের অবদানে গড়া বর্তমানের এই সভ্যতাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে নতুন করে সভ্যতার ভিত্ পত্তন কর এবং গড়ে তোল।

পরের ধনে পোদ্দারী করতে তোমাদের লজ্জা হয় না? লজ্জা করা যে উচিত সে বোধও কি তোমাদের নেই? তোমরা আবার সভ্য হলে কি করে? এই কি তোমাদের সভ্যতার নমুনা?

ফিরে যাওয়ার সময়ে তারা হয়তো শেষ বারের মতো বলতো "হে আমাদের সুযোগ্য বংশ ধরেরা! তোমাদের বিবেচনায় আমরা তো অসভ্য এবং বর্বর আর তোমরা হলে সভ্য. শিক্ষিত, সংস্কৃত এবং আরো কত কিছু!

www.pathagar.com

এবারে হিসেব করে দেখতো এত সভ্য শিক্ষিত হয়েও তোমাদের মধ্যে চোর, ডাকাত, প্রতারক, প্রবঞ্চক, কপট, মিথ্যাবাদী, জুয়ার, মদখোর, জালেম, খুনী, ঘুষখোর, সুদখোর প্রভৃতির সংখ্যা কত এবং তোমরা যতই সভ্যতার দিকে এগিয়ে চলেছো ততই এদের সংখ্যা, শক্তি, কলাকৌশল প্রভৃতি ততই বেড়ে চলেছে কিনা ?

অথচ খোঁজখবর নিলে দেখতে পাবে যে, তোমাদের ভাষায় অসভ্য বর্বর হয়েও আমরা চোর-ডাকাত ছিলাম না, জুয়ার, প্রতারক ছিলাম না, সুদখোর, ঘুষখোর প্রভৃতিও ছিলাম না। হে বাছাধনেরা, এবারে বুকে হাত দিয়ে বলতো আসল বর্বর এবং আসল অসভ্য কারা ? তোমরা—না আমরা ?"

এবারে আসুন আমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎটা একবার ভেবে দেখি।

আমরা জানি—মানুষ প্রগতিশীল জীব, অর্থাৎ এগিয়ে চলাই তার কাজ। একদিন শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করতঃ আজ অনন্ত মহাশূন্যে বিজয় অভিযান তার এই প্রগতিশীলতারই জাজ্জল্যমান প্রমাণ বহন করছে।

এই অভিযান চলছে এবং চলতে থাকবে। কবে যে এর শেষ হবে অথবা মোটেই হবে কি না সেকথা আমরা জানিনা।

এখন আমরা যেমন কয়েক হাজার বছর পাশ্চতের মানুষদিগকে অসভ্য বর্বর বলছি এখন থেকে কয়েক হাজার বছর পরে যারা এই পৃথিবীতে থাকবে তারা যদি অনুরূপভাবে আমাদিগকে অসভ্য বর্বর বলে তবে প্রতিবাদ করার কিছু থাকবে না। কেননা তখন তারা যেখানে এগিয়ে যাবে সেখান থেকে আমাদের বর্তমান অবস্থার মূল্যায়ন করলে আমাদিগকে অসভ্য বর্বর ছাড়া আর কিছু বলার যৌক্তিকতাই তারা উপলব্ধি করবে না। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা অসভ্য নই, বর্বরও নই।

অতএব এই আলোচনা থেকে আমরা অনায়াসে ধরে নিতে পারি যে, পরবর্তী সময়ে নানা কারণে বিচ্ছিন্ন কতিপয় দল বর্বরতায় আচ্ছন্ন হলেও আদি মানব এবং তার সাথে ঘনিষ্ট মহলের কেউ অসভ্য বর্বর ছিলেন না।

এই পটভূমিকার পরে আমাদের মূল বক্তব্য শুরু করা যাচ্ছে।

www.pathagar.com

দীন, ধর্ম ও রিলিজিয়ন

ভাব ও ভাষা

দীন, ধর্ম ও রিলিজিয়ন (*Religion*) তিন ভাষার তিনটি শব্দ। এই শব্দ তিনটির বুৎপত্তি-গত তাৎপর্যের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অথচ কারণ যা-ই হোক অন্ততঃ এই ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ অর্থাৎ আমরা এই তিনটি শব্দকে সমার্থ-বোধক মনে করতঃ একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে চলেছি।

শিক্ষিত কোন ব্যক্তিরই একথা অজানা নয় যে, প্রতিটি ভাষায়ই এমন কিছু বিশেষ বিশেষ শব্দ থাকে পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায়ই সেগুলোর হুবহু কোন প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া যায়না। অগত্যা জোড়াতালি দিয়ে কোনও রূপে কাজ চালিয়ে যেতে হয়। ফলে মূল শব্দটির নিজস্ব শক্তি, সৌন্দর্য ও তাৎপর্য ঢাকা পড়ে যায়; শ্রোতার মনে যে ভাব, প্রেরণা ও উপলব্ধির সৃষ্টি ও সেই উপলব্ধিকে সার্থক ভাবে অভিব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে শব্দটির সৃষ্টি করা হয়েছিল সে-উদ্দেশ্যটাই ভীষণ ভাবে ব্যর্থ ও ব্যহত হয়।

বলাবাহুল্য, এই ব্যর্থতার কথা চিন্তা করেই উপরোক্ত তিনটি শব্দের বুৎপত্তি-গত তাৎপর্য নির্ণয়ের কাজে হাত দেয়া হয়েছে।

এ কাজটি যে খুবই জটিল, শ্রমসাধ্য এবং স্পর্শ-কাতর সে সম্পর্কে দ্বিমতের কোন অবকাশই থাকতে পারেনা। অতএব সকল প্রকারের গোঁড়ামী, ভাবপ্রবণতা, একগুঁয়েমী পরিহার ও নিরপেক্ষ এবং সত্যানুসন্ধিৎসু মন নিয়ে পরবর্তী আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্যে সকলের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়ে রাখছি।

উপরোক্ত শব্দ ত্রয়ের তাৎপর্য জানতে হলে আমাদিগকে যে অতি অবশ্যই সর্বপ্রথমে ভাষা এবং শব্দ-সৃষ্টির ইতিহাস জেনে নিতে হবে সে-কথা বলাইবাহুল্য।

www.pathagar.com

আমরা জানি এবং বেশ ভাল ভাবেই জানি যে, ভাষা ভাবের বাহন। অর্থাৎ নানা কারণে আমাদের মনে যে-সব ভাবের উদয় হয় তাকে প্রকাশ বা অভিব্যক্ত করার জন্যে আমরা ভাষাকে বাহনরূপে ব্যবহার করে থাকি।

যতদূর জানা যায়—যতদিন এই ভাষার উদ্ভাবন সম্ভব হয় নি ততদিন আমাদিগকে অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষ অন্যকথায় আদি মানবদিগকে ইশারা-ইঙ্গিত এবং অঙ্গ-ভঙ্গীর সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ বা ভাবের আদান-প্রদান করতে হয়েছে।

ভাষা যে ভাব-প্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বাধিক শক্তিশালী বাহন সে সম্পর্কে দ্বিমতের কোন অবকাশ না থাকলেও এই বাহনের ব্যবহার করতে গিয়ে বক্তব্যকে সহজ, সরল, শক্তিশালী এবং সকল মহলের কাছে বোধগম্য করে তোলার জন্য প্রয়োজন বোধে আজও আমাদিগকে ইশারা-ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গীর সাহায্য নিতে হয়।

তবে এই বাহন দুটির ব্যবহারের সময়ে বিশেষ ভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কেননা, অতীতের কথা জানা না গেলেও বর্তমানে উক্ত বাহন দুটি বা ওদের কোন একটিকে যখন-তখন, যেখানে-সেখানে এবং প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ব্যবহার করা অনেকের কাছেই দৃষ্টিকটু ও বিরক্তিকর বিবেচিত হয়; এবং অনেকেই এইরূপ অসতর্ক এবং অপব্যবহারকারীদিগকে "মুদ্রাদোষ" গ্রস্ত বলে মন্তব্য করতেও দ্বিধা বোধ করেন না।

সে যাহোক, একটি প্রগতিশীল জাতি হিসেবে ইশারা-ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গীর স্তর কাটিয়ে উঠে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষ এমন কি একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মানুষ যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সৃষ্টি করে নিয়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের চোখের সম্মুখেই রয়েছে।

শুধু ভাষার দিক দিয়েই নয়—চাল-চলন, আচার ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ; খাদ্যাখাদ্য, ধর্মীয় ধারণা-বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রভৃতির দিক দিয়েও যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের এমন কি একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মানুষদিগের মধ্যে কমবেশ পার্থক্য রয়েছে সে দৃশ্যও আমরা সর্বদা লক্ষ্য করে চলেছি।

www.pathagar.com

মানুষে মানুষে কেন এবং কিভাবে এই কৃত্রিম ভিন্নতার সৃষ্টি হলো মানবসমাজের অখণ্ড ঐক্যের স্বার্থে সে কথা জানা খুবই প্রয়োজন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তা নিয়ে আলোচনার সুযোগ না থাকায় শুধু ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সৃষ্টি সম্পর্কেই আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হচ্ছে।

ভিন্ন ভিন্ন ভাষা কেন এবং কিভাবে সৃষ্টি হলো যে সম্পর্কে আলোকপাত করতে হলে কিছুটা পটভূমিকার প্রয়োজন, আর তা হলো ঃ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পরিবেশ তথা ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, খাদ্যাখাদ্য প্রভৃতি কমবেশ ভিন্ন ভিন্ন। পরিবেশের প্রভাব জীবজগত বিশেষ করে মানব সম্প্রদায়ের প্রতি যে কত প্রকট এবং এই প্রভাবকে কাটিয়ে ওঠা বা পাশ কাটিয়ে যাওয়া যে কোনক্রমেই সম্ভব নয় তার বহু বাস্তব ও জাজ্জল্যমান প্রমাণ আমাদের চোখের সম্মুখেই রয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষদিগের দৈহিক গঠন, নাসিকা, গাত্রবর্ণ, মাথার চুল প্রভৃতির ভিন্নতার কথা তুলে ধরা যেতে পারে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষদিগের মন-মেজাজ, ধৈর্য-সহনশীলতা, অভ্যাস-আচরণ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ধারণা-বিশ্বাস, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাখাদ্য প্রভৃতিও যে কমবেশ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এবং পরিবেশের প্রভাবই যে এ জন্যে দায়ী সে-কথাও শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই জানা রয়েছে।

বিষয়টিকে সকল শ্রেণীর মানুষদিগের কাছে বোধগম্য করে তোলার জন্যে আরো পরিষ্কার করে বলা যাচ্ছে যে, এই পরিবেশের ভিন্নতার কারণেই এক পরিবেশে গড়ে ওঠা মানুষদিগের কাছে বৈধ, পবিত্র এবং উপাদেয় বলে গৃহীত কোন কোন খাদ্য-বস্তু ভিন্ন পরিবেশে গড়ে ওঠা মানুষদিগের কাছে অবৈধ, অপবিত্র এবং অতীব ঘৃণার বস্তু বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

অনুরূপ ভাবে এক পরিবেশে গড়ে ওঠা মানুষদিগের যে সব বিশ্বাস, আচারানুষ্ঠান এবং কার্যকলাপকে বিশেষ পুণ্যজনক

www.pathagar.com

হিসেবে অতীব নিষ্ঠার সাথে পালন করতে দেখা যায় ভিন্ন পরিবেশে গড়ে ওঠা মানুষদিগকে সেসব বিশ্বাস, আচারানুষ্ঠান এবং কার্যকলাপকে ভীষণভাবে ঘৃণ্য, পাপজনক ও কুসংস্কার বিবেচনায় সভয়ে ওসব থেকে দূরে থাকতে দেখা যায়।

এসব উদাহরণ আমাদের চোখের সম্মুখেই রয়েছে সুতরাং বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখেনা। এবারে আসুন আমাদের-মূল আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ ধর্ম শব্দটির উদ্ভব কিভাবে হলো সে-কথা জানার চেষ্টা করি।

মানুষের মনে ধর্ম-বিশ্বাসের সৃষ্টি যে পৃথিবীর একটি অতি প্রাচীনতম ঘটনা পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী, প্রত্নতাত্ত্বিক, পুরাতাত্ত্বিক প্রভৃতিরা সে সম্পর্কে ঐক্যমত পোষণ করেন।

মানুষের মনে ধর্ম-বিশ্বাস সৃষ্টির হাজার হাজার বছর পরে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে বলেও তাদের মধ্যে ঐক্যমত দেখতে পাওয়া যায়।

বিশেষজ্ঞ মহলের এই অভিমত সত্য হলে আমাদিগকে অতি অবশ্যই ধরে নিতে হয় যে, আদি মানবেরা সুদূরের সেই প্রাচীনকাল থেকে হাজার হাজার বছর যাবৎ তাদের মনে বিশেষ ধরনের যেসব বিশ্বাস পোষণ ও তদনুযায়ী যেসব অনুষ্ঠানাদি পালন করে এসেছে সে-সবের নাম তারা জানতো না। অর্থাৎ নাম-পরিচয় না জেনেও হাজার হাজার বছর তারা এই বিশ্বাস পোষণ ও অনুষ্ঠান পালনের কাজ চালিয়ে এসেছে। অবশেষে তাদের হাজার হাজার বছর পরবর্তী বংশধরদিগের যিনি বা যাঁরা ভাষার সৃষ্টি করেছেন তিনি বা তাঁরা এই কাজটিকে 'ধর্ম' নামে অভিহিত করেছেন।

অবশ্য নাম না জেনে শুধু অভ্যাসের বশে হাজার হাজার বছর কোন বিশ্বাস পোষণ ও অনুষ্ঠান পালনকে আমরা অসম্ভব বলতে চাইনা। ধর্মের জন্ম ও তার নাম করণের মধ্যে সময়ের যে বিরাট ব্যবধান বিশেষ কারণে সে-কথাটিকেই সুস্পষ্ট করে তোলা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য। সময়ের এই ব্যবধানের কথাটি

www.pathagar.com

স্মৃতিতে জাগরূক রেখে এবারে আসুন কেন এবং কিভাবে আদি মানবদিগের মনে ধর্ম-বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল সেকথা জানার চেষ্টা করি।

কিন্তু অসুবিধা হলো—যেহেতু বিশেষজ্ঞদিগের মতে ধর্ম-বিশ্বাস সৃষ্টির হাজার হাজার বছর পরে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে অতএব কেন, কবে এবং কিভাবে ধর্ম-বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে লেখ্য ভাষার মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ভাবে সে-কথা জানা সম্ভব হতে পারেনা।

খুব সম্ভব এজন্য একটি মাত্র উপায়ই আমাদের জন্য খোলা রয়েছে। সে উপায়টি হলো: পৃথিবীর সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী, প্রত্নতাত্ত্বিক, পুরাতাত্ত্বিক প্রভৃতিরা গভীর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে এ সম্পর্কে যেসব অভিমত ব্যক্ত করেছেন সেগুলোর সাহায্যে যতদূর সম্ভব সঠিক একটা ধারণায় উপনীত হতে চেষ্টা করা।

বলাবাহুল্য, তাঁদের অভিমতসমূহকে পৃথক পৃথক ভাবে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তুলে ধরা সম্ভব নয়। অতএব এ সম্পর্কীয় গবেষণায় যেসব বিষয়ে তাঁরা অভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন সে গুলোর সার-সংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে। পরে 'অভিমত' উপ-শিরোনাম দিয়ে কতিপয় মনীষির এ সম্পর্কীয় অভিমতকে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা হবে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হলেও প্রাণীজগতে একমাত্র মানুষই সর্বাধিক দুর্বল, সর্বাধিক অসহায় এবং সর্বাধিক পর-মুখাপেক্ষী।

এমতাবস্থায় সুদূর অতীতের সেই আদি মানবেরা কত বেশী দুর্বল, কতবেশী অসহায় এবং কত বেশী পর মুখাপেক্ষী ছিল সে-কথা ভাবতেও আজ আমাদের শরীর ভয়ে-বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

জড়া-বার্ধক্য, রোগ-ব্যাধি, মড়ক-মহামারী, মৃত্যু প্রভৃতির ভয়ে সেদিনের আদি মানবেরা ভীষণ ভাবে শঙ্কিত দিশেহারা হয়ে পড়েছে এবং তাদের অনভিজ্ঞ ও অপরিপক্ক মন-মানস দিয়ে চিন্তা করত: এসবকে কোন না কোন ক্রূঢ় ও দুর্মদ অশরীরী শক্তির ক্রোধ ও অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ বলে ধরে নিয়েছে।

www.pathagar.com

কাকুতি-মিনতি প্রকাশ ও ভোগভেট নিবেদনের মাধ্যমে দুর্মদ ও ক্রোধ পরায়ণ ব্যক্তিদিগের ক্রোধ প্রশমন ও সন্তুষ্টি অর্জন যে সম্ভব তার বাস্তব অভিজ্ঞতা এই আদি মানবদিগের ছিল। ফলে ওসব কল্পিত শক্তির বেলায়ও তারা সেই অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগিয়েছিল।

অনুরূপ ভাবে ঝড়-ঝঞ্ঝা, প্লাবন, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, জলোচ্ছাস প্রভৃতির তাণ্ডবতায় পর্যুদস্ত ও দিশাহারা হয়ে তারা ওসবের পশ্চাতে মহাশক্তিধর কোন না কোন দৈত্য, দানব, ভূতপ্রেতাদির অস্তিত্ব কল্পনা করে নিয়েছে এবং নিজেদের অপরিপক্ক ও জড়তাগ্রস্থ মন-মস্তিষ্ক দিয়ে ওসব দৈত্য-দানবাদির সন্তুষ্টি বিধানের পথ ও পদ্ধতির উদ্ভাবন করে নিয়েছে।

মোট কথা, এমনি ভাবে যা কিছু ভীতিজনক, চমকপ্রদ, বিস্ময়কর, আপনাপেক্ষা শক্তিশালী, উপকারী বা অপকারী বলে তাদের কাছে বিবেচিত হয়েছে তাকেই তারা উপাস্যের আসনে বসিয়েছে এবং নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ওসবের উদ্দেশ্যে আনুগত্য প্রকাশের পথ ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করে নিয়েছে।

বিশেষজ্ঞ মহলের এই অভিমত জানার পরে এবারে আসুন আমরা আমাদের মূল বক্তব্যে ফিরে যাই।

আদি মানবদিগের মনে ধর্ম-বিশ্বাসের সৃষ্টি হওয়ার হাজার হাজার বছর পরে ভাষা সৃষ্টি হওয়ার কথা উপরোক্ত বিশেষজ্ঞদিগের অভিমত থেকেই আমরা জানতে পেরেছি।

ধর্ম-বিশ্বাস বলতে কি বোঝায় এবং কিভাবে তার সৃষ্টি হয়েছিল বিশেষজ্ঞদিগের অভিমত থেকে সেকথাও আমরা এই মাত্র জানতে পারলাম।

ভাষা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে হাজার হাজার বছর ধরে এই বিশ্বাস এবং আচারানুষ্ঠানাদি বংশানুক্রমিক ভাবে চালু থাকার ফলে তা যে তদানিন্তন মানুষদিগের মন-মানসে গভীরভাবে শিকর গেড়ে বসার সুযোগ পেয়েছিল সেকথা বলাই বাহুল্য।

অতএব ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বসবাসকারী ব্যক্তিদিগের যিনি বা যাঁরা ভাষার সৃষ্টি করেছিলেন তিনি বা তাঁরা যে তাঁদের নিজ

www.pathagar.com

নিজ পরিমণ্ডলের মানুষদিগের মন মানস, আচার-ব্যবহার, ধারণা-বিশ্বাস, প্রয়োজন-পরিবেশ প্রভৃতির কথা কঠোর ভাবে স্মৃতিতে জাগরূক রেখে এবং একমাত্র তাদেরই মনের ভাব প্রকাশের সুযোগ করে দেয়ার জন্য ভাষা সৃষ্টির কাজে হাত দিয়েছিলেন সেকথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

অতএব, ভাষা যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন পরিমণ্ডল ভূক্ত মানুষদিগের একান্ত রূপেই নিজস্ব এবং এ-সব সৃষ্টি করার সময়ে অন্য কোন দেশ এবং অন্য কোন পরিমণ্ডল ভূক্ত মানুষদিগের কথা চিন্তা করার সামান্যতম প্রয়োজনও যে তত্রত্য ভাষা সৃষ্টিকারীদিগের কাছে অনুভূত হয় নি সেকথা খুলে বলার প্রয়োজন হয়না।

বলাবাহুল্য, 'ধর্ম'' শব্দটি সংস্কৃত ভাষার একটি বিশিষ্ট শব্দ। অতএব এই শব্দটি যে একান্ত রূপেই সংস্কৃত ভাষা-ভাষী মানব গোষ্ঠীর মনের ভাব প্রকাশ ও তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যম সে-সম্পর্কে দ্বিমতের কোন অবকাশই থাকতে পারেনা। তথাপি বিষয়টিকে আরো সহজে বোঝানোর জন্যে কতিপয় বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ উদাহরণকে নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে ঃ

০ প্রথমেই ভারতীয় তথা সংস্কৃত ভাষাভাষী মানুষদিগের মধ্যে একবালে প্রচলিত 'বর্ণ-ব্যবস্থা'র কথা তুলে ধরা যেতে পারে। বলাবাহুল্য, তদানিন্তন পরিবেশ ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তাদের মাঝে এই বর্ণ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল।

পুরাণ-ভাগবতাদির বিবরণে প্রকাশ ঃ গুণ এবং কর্মানুযায়ী ভগবান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারটি বর্ণের সৃষ্টি করেছিলেন।

উল্লেখ্য যে, 'বৃ' ধাতু থেকে বর্ণ শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়েছে। 'বৃ' ধাতুর অর্থ—বরণ করা। অর্থাৎ গুণ এবং যোগ্যতা অনুযায়ী যিনি যে কাজ বা কাজসমূহকে বরণ করে নিতেন তিনি সেই বর্ণের মানুষ বলে অভিহিত হতেন।

বলাবাহুল্য, সংস্কৃত ভাষার স্রষ্টা বা স্রষ্টাবৃন্দ এই ভাবে বিভক্ত চারটি খণ্ডকে পৃথক পৃথক ভাবে বোঝানো বা ব্যক্ত করার

www.pathagar.com

জন্য বর্ণ শব্দটির সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং সংস্কৃত ভাষাভাষী এবং এই পরিমণ্ডলভুক্ত মানুষেরা বর্ণ শব্দটি শোনার সাথে সাথে এই শব্দটির তাৎপর্য বা এতদ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে অনায়াসে সেকথা বুঝতে পারে।

পক্ষান্তরে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশ বা অন্য ভাষাভাষী মানুষেরা বর্ণ-বিভাগের সাথে পরিচিত নয়—বর্ণ শব্দের দ্বারা এ ধরনের বিভাগকে বুঝতে পারাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

'বর্ণ' বলতে তাদের ভাষায় বিভিন্ন রং বা Colour-কে তারা বোঝেন। ফলে গুণ এবং কর্মের ভিত্তিতে নয়—বরং প্রাকৃতিক নিয়মে গাত্রবর্ণের পার্থক্যের জন্য শ্বেতকায় এবং কৃষ্ণকায় এ দুশ্রেণী মানুষ সৃষ্টি হয়েছে বলে তারা বিশ্বাস পোষণ করেন।

তবে দেহ-বর্ণের এই পার্থক্য ঘটার কারণ সম্পর্কে ভিন্ন ধরনের বিশ্বাস পোষণ করেন এমন মানুষও রয়েছেন এবং তাঁদের সংখ্যাও মোটেই নগণ্য নয়। তাঁদের এ বিশ্বাস ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এই বিশ্বাসের কারণে শ্বেতকায় এবং কৃষ্ণকায় উভয় সম্প্রদায়ই নিজদিগকে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র এবং অপরকে তাঁর অভিশপ্ত বলে দাবী করেন। এবং ঈশ্বরের অভিশাপের কারণেই অপর পক্ষের দেহের রং শাদা বা কালো হয়েছে এ দাবীও ধর্মীয় বাণীর বরাত দিয়ে তারা করে থাকেন।

০ বর্ণ-বিভাগ হওয়ার বেশ কিছুকাল পরে হিন্দুসমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার কথা সকলেরই জানা রয়েছে। বেদের বর্ণনা থেকে জানা যায়ঃ ভগবান তাঁর মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয় এবং উরুদেশ ও পদযুগল থেকে যথাক্রমে বৈশ্য এবং শূদ্র জাতির সৃষ্টি করেছেন।

এই জাতি চতুষ্টয় যে ভগবানের অঙ্গ-জাত সেকথা বোঝানো বা ব্যক্ত করার জন্য সংস্কৃত ভাষার উদ্ভাবক বা উদ্ভাবক মণ্ডলী উক্ত ভাষার 'জাতি' শব্দটি সৃষ্টি করেছিলেন।

তা ছাড়া 'জাতি' শব্দের সাথে 'জনন'-এর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকায় জনক-জননীর জননক্রিয়াজাত ফসলসমূহকে বোঝানো বা অভিব্যক্ত করার জন্যও জাতি শব্দটিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষেরা ভগবানের মুখ, বাহু, উরু, প্রভৃতি থেকে ভিন্ন ভিন্ন জাতি সৃষ্টি হওয়ার কথা বিশ্বাস করে না। জাতি বলতে সেই সব দেশের ভাষা সৃষ্টিকারীগণ তাঁদের নিজ নিজ ভাষায় Nation, ক্বওম, মিল্লাৎ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সৃষ্টি করেছেন।

জাতি বলতে ঐ সব দেশের কোন দেশ এক ভাষাভাষী জন-গোষ্ঠীকে, কোন দেশ একই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বসবাসকারী জন-গোষ্ঠীকে আবার কেউবা একই আদর্শ বা একই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দর্শনে বিশ্বাসী জন-গোষ্ঠীকে বুঝে থাকেন।

০ এদেশের হিন্দুগণ যাতে তাঁদের বিশ্বাস ও প্রথানুযায়ী অনুষ্ঠিতব্য অর্চনা আরাধনার কাজটিকে একটি বিশেষ শব্দের সাহায্যে অতি সহজে ও সংক্ষেপে বুঝতে সক্ষম হন সেজন্য সংস্কৃত ভাষার স্রষ্টা বা স্রষ্টাগণ 'পূজা' শব্দটি সৃষ্টি করেছিলেন।

ফলে এই শব্দটি শ্রুতিগোচর হওয়ার সাথে সাথে যে কোন একজন হিন্দুর মানস-লোকে বেদীর উপরে যে কোন এক বা একাধিক দেব বা দেবীর মূর্তি, একটি ঘট, ফুল, বেলপাতা, নৈবেদ্য, কোষাকোষী, শঙ্খ, ঘন্টা ধূপতি এবং জনৈক ব্রাহ্মণ এসব কিছুকে সম্মুখে রেখে তাঁর ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা কোন যজমান অথবা কোন বিশেষ শ্রেণীর মানুষদিগের সৌভাগ্য অর্জন, ধন-ধান্যাদি লাভ, রোগ মুক্তি, বিপাদাপদ থেকে পরিত্রাণ লাভ প্রভৃতির এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের সংকল্প নিয়ে মন্ত্রপাঠাদি করে চলেছেন এমন একটি দৃশ্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

পক্ষান্তরে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষদিগের কাছে পূজা শব্দটি বা তার তাৎপর্য বোধগম্য নয়। বিশেষ করে পৃথিবীর একত্ববাদী জনগোষ্ঠীর কাছে এধরনের কাজ ভীষণভাবে পাপজনক ও অবমাননাকর বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

এমন কি মূর্তিপূজা বা পৌত্তলিকতার কাজে ব্যবহৃত শব্দ-গুলি যেমন অর্ঘ, অঞ্জলী, লগ্ন, বোধন, পায়ণ, পাদ্য (মূর্তির পা ধোয়ার জল) অর্ঘ (অভিনন্দন দ্রব্য), আচমনীয় (খাবার পূর্বে মুখ ধোয়ার জল), নৈবেদ্য (মূর্তির খাদ্য), পুনরাচমনীয় (খাবার

www.pathagar.com

পরে মুখ ধোয়ার জল), তাম্বুল (পানশুপারী) প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারকেও তাঁরা তাঁদের একত্ববাদী ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী বলে গভীরভাবে বিশ্বাস পোষণ করেন।

ঐসব একত্ববাদী জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মুসলমানগণ যাতে এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র অর্চনা আরাধনার কাজকে সহজে ও সংক্ষেপে বুঝতে সক্ষম হয় সেজন্য আরবী অর্থাৎ ইসলামী পরিভাষায় 'সালাত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ফলে 'সালাত' শব্দটি শ্রুতিগোচর হওয়ার সাথে সাথে বিশ্বের যেকোন দেশের যে কোন ভাষাভাষী একজন মুসলমাননের মানস লোকে অযু, আযান, একামত, একজন যোগ্য নেতার পশ্চাতে অতীব শৃংখলার সাথে ও নিবিষ্ট মনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো, একাগ্রচিত্তে নীয়ত করা, নির্দিষ্ট প্রার্থনা বাণী উচ্চারণ, মহান স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য নত ও অবনত হওয়া এবং বিশ্ববাসীর জন্য শান্তি, অনুগ্রহ ও প্রাচুর্য কামনা করতঃ সালাম ফেরানোর দৃশ্য ভেসে ওঠে।

অতএব, উদ্দেশ্য এক হলেও পূজা এবং সালাত শব্দদ্বয়ের বুৎপত্তিগত তাৎপর্য এক এবং অভিন্ন নয়, একটি অপরটির প্রতি-শব্দ বা শব্দ দুটি সমার্থবোধকও হতে পারেনা।

আশা করি এ সম্পর্কে আর অধিক উদাহরণ তুলে ধরার প্রয়োজন হবেনা। অতঃপর আমাদের আলোচ্য শব্দত্রয় অর্থাৎ দীন, ধর্ম এবং রিলিজিয়ন তিন ভাষায় এই তিনটি বিশেষ শব্দের বুৎপত্তি গত তাৎপর্য কি এবং এ-সবের একটি অন্যটির প্রতি-শব্দ রূপে ব্যবহৃত হতে পারে কিনা সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

এজন্য প্রথমে আমরা বাঙলা ভাষার বিখ্যাত অভিধান সমূহে 'ধর্ম' শব্দের বিপরীতে যে কথাগুলো লিপিবদ্ধ থাকতে দেখা যায় সে গুলোকে হুবহু উদ্ধৃত করবো এবং পরে কতিপয় ধর্মশাস্ত্র এবং কয়েকজন প্রখ্যাত পণ্ডিত ও গবেষকের এ-সম্পর্কীয় অভিমতকে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনাম দিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরবো।

www.pathagar.com

'ধর্ম' শব্দের তাৎপর্য

অভিধান মতে :

১) সৎকর্ম অনুষ্ঠান-জন্য গুণ বি; সুকৃত; শুভাদৃষ্ট; পুণ্য; শাস্ত্রানুযায়ী আচার ব্যবহার; বেদ-বিহিত অনুষ্ঠান, রীতি; আচার, কর্তব্য; ভাব; স্বাভাবিক অবস্থা, গুণ, শক্তি *property, attributle,* স্বভাব, সাদৃশ্য, লগ্নের নবম স্থান, দেশ বি; জাতি বি; ঈশ্বর, পরকাল প্রঃ অলৌকিক পদার্থ বিষয়ক বিশ্বাস ও উপাসনা প্রণালী; উচিত কর্ম, অবশ্য কর্তব্য কর্ম; ষড়্‌বিধ পুণ্যকর কাজ [যথা—যোগ্যপাত্রে দান, কৃষ্ণে মতি, মাতা পিতার সেবা, শ্রদ্ধা, বলি, গরুকে আহার্য দান। ধর্মের অঙ্গ দশটি; যথা—ব্রহ্মচর্য, সত্য, তপ; দান, নিয়ম, ক্ষমা, শুচিতা, অহিংসা, শান্তি, অস্তেয় (চুরি না করা)। ধর্মের মূল এই গুলি : অদ্রোহ, অলোভ, দম, জীবে দয়া, তপ, ব্রহ্মচর্য, সত্য, ক্ষমা ধৃতি]; (অভিধান মতে) সৎসঙ্গ; (দীপিকা মতে) পুরুষের বিহিতক্রিয়া-সাধ্যগুণ; (মহাভারত মতে) অহিংসা, (পুরাণ মতে) যাহা দ্বারা লোক স্থিতি বিহিত হয়; (যুক্তিবাদী মতে) মানুষের যাহা কর্তব্য তাহা সম্পাদন; (জ্ঞানবাদ মতে) মনের যে প্রবৃত্তি দ্বারা বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জন্মে। বিঃ প্রঃ বা ক্লী।

২) যম, আত্মা, জীব, ন্যায়-অন্যায় ও পাপ-পুণ্যের বিচার কর্তা, ঈশ্বর, দেবতা বিঃ [বিষ্ণুর বক্ষস্থল থেকে এঁর জন্ম হয়। ইনি দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যাকে বিবাহ করেন,] ধৃ+মন কর্তৃ। বিঃ পুঃ।

ধর্মের ষাঁড়, বৃষোৎসর্গে উৎসর্গীকৃত বৃষ, স্বচ্ছন্দচারী ব্যক্তি।
—আশুতোষ দেব প্রণীত নূতন বাঙ্গালা অভিধান।

ধর্ম শব্দের এই তাৎপর্য থেকে অন্যান্য গুণাবলী ছাড়াও যম, আত্মা, জীব, ঈশ্বর এবং বিষ্ণুর বক্ষস্থল থেকে উৎপন্ন ও দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যাকে বিবাহকারী জনৈক দেবতাকেও যে ধর্ম বলা হয়ে থাকে সেকথা আমরা জানতে পারলাম।

www.pathagar.com

মহাভারতের মতে ঃ

০ মহাভারত থেকে জানা যায় ঃ পাণ্ডুর পত্নী কুন্তির গর্ভে যম যুধিষ্ঠিরের জন্মদান করেন। যমের অন্যতম নাম ধর্ম, সেই কারণে যুধিষ্ঠিরকে 'ধর্মপুত্র' বলা হয়ে থাকে।

০ মহাভারতের বিবরণ থেকে একথাও জানা যায় যে, পাণ্ডবগণ অজ্ঞাত বাসে থাকাকালে একদা পিপাসায় কাতর হন এবং মায়া সরোবরে জলপান করতে যান, সে সময়ে উক্ত সরোবরের তীরবর্তী এক বৃক্ষ-শাখায় ধর্ম বকরূপে অবস্থান করছিলেন এবং পান্ডবদিগকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বকরূপী ধর্মের একটি প্রশ্ন ছিল—'ধর্ম' কোথায় আছে ? যুধিষ্ঠির উত্তরে বলেছিলেন ঃ

বেদাঃ বিভিন্না ঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না ঃ
নসৌ মুনির্যস্য মতং নঃ ভিন্না ঃ
ধর্ম'স্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়ং
মহাজনো যেন গতাঃ সঃ পন্হা।

অর্থাৎ—বেদ ভিন্ন ভিন্ন, স্মৃতিশাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন, মুনিদিগের মতও অভিন্ন নয়। ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত রয়েছে। মহাজনগণ যেপথে গমন করেন তাই (ধর্ম) পথ।

এখানে স্বভাবতঃই কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। তার একটি হলো ঃ চার খানা বেদ, ছয় খানা স্মৃতিশাস্ত্র এবং মুণিদিগের পরস্পরের মত ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার জন্য ধর্মের তত্ত্ব জানা যেখানে সম্ভব নয়—সেখানে মহাজনগণ ধর্মের তত্ত্ব কোথা থেকে জানবেন ?

এই প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তরই হতে পারে। আর তা হলো তাঁরা নিজ নিজ জ্ঞান, বিবেক এবং প্রজ্ঞা-প্রতিভা অনুযায়ী নিজেরাই ধর্মের তত্ত্ব নির্ধারণ করে নেবেন।

কিন্তু এর পরেও কথা থেকে যায় যে, মহাজনদিগের সকলের জ্ঞান, বিবেক এবং প্রজ্ঞা-প্রতিভা সমান বা একই রূপ হতে পারেনা। ফলে তাঁদের নির্ধারিত তত্ত্ব বা অভিমত ভিন্ন ভিন্ন হতে বাধ্য। এমতাবস্থায় ওসবের কোন্‌টি সঠিক বা সর্বোত্তম তা নির্ণয় করবে কে ?

www.pathagar.com

স্বভাবতঃই এ দায়িত্ব সাধারণ মানুষদিগের গ্রহণ করতে হবে। ফলে শুধু সেই পুরাতন মতভেদই আবার নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে না—নতুন করে সংঘাত-সংঘর্ষ সৃষ্টির প্রবল আশঙ্কাও যে রয়েছে সেকথা একরূপ নিশ্চিত রূপেই বলা যেতে পারে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো ঃ "ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত রয়েছে" কথাটির তাৎপর্য কি ? যুধিষ্ঠির এতদ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন ? কেউ কেউ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে. গুহা শব্দের দ্বারা যুধিষ্ঠির কোন দুর্গম ও অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানকেই বোঝাতে চেয়েছেন।

আবার কেউ কেউ মনে করেন যে তখন প্রকৃত ধর্ম বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব বিদ্যমান না-থাকার কথা বোঝানোর জন্যই যুধিষ্ঠির 'গুহা' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

যারা এ দু'দলের মত সমর্থন করেন না তাঁরা বলেন ঃ কোন দুর্গম বা অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থান কিংবা কোন কিছুর অবিদ্যমানতার কথা বোঝানোর জন্য 'গুহা' শব্দ ব্যবহার করতে হয় না। বরং এখানে গুহাকে সুনির্দিষ্ট রূপে বোঝানোর জন্যই 'গুহা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে: বাচন ভঙ্গীর দিকে লক্ষ্য করলেও সে কথাই সুস্পষ্ট রূপে বুঝতে পারা যায়।

অন্য একদল চিন্তাবিদ "ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত" থাকা সম্পর্কে শেষোক্তদিগের অভিমত-কে সমর্থন করেন এবং দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেণ যে এতদ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাবের ভবিষৎবাণী করা হয়েছে।

তাঁদের এই দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টির কারণ স্বরূপ তাঁরা বলেনঃ যেদিন শুধু ভারতবর্ষ এবং শুধু হিন্দুসমাজই নয়—গোটা বিশ্বের একখানা ধর্মগ্রন্থ এবং একজন মহাপুরুষের জীবনীও অক্ষত. অবিকৃত এবং অনতিরঞ্জিত ছিলনা ফলে অন্যায়-অধর্মের সীমাহীন অন্ধকার গোটা বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলেছিল সেদিন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) একমাত্র মহাপুরুষ যিনি হেরা নামক পর্বত গুহায় সাধনা করেছিলেন এবং প্রকৃত ও সত্য-সনাতন ধর্মের তত্ত্ব বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

তাঁদের এই দাবীর সমর্থনে তাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আগমণ সম্পর্কীয় ভবিষ্যৎ-বাণীসমূহ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেন।

এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত হওয়ার জন্য তাঁরা আগ্রহী পাঠকবর্গকে প্রখ্যাত পণ্ডিত ডঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় (এম, এ, সংস্কৃত বেদ, রিসার্চ স্কলার, প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রয়াগ) মহাশয়ের হিন্দি ভাষায় লিখিত 'কল্কী অবতার,' 'নারসংশ' 'অন্তিম ঋষি' 'মৈত্রেয়' ''ধর্মীয় ঐক্যের জ্যোতি'' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ অথবা সুপণ্ডিত অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় এম, এ, কর্তৃক এসব গ্রন্থের একত্রে সংকলিত বঙ্গানুবাদ ''বেদ-পুরাণে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)'' নামক গ্রন্থখানা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করার অনুরোধ জানান।

বলাবাহুল্য, ধর্ম শব্দের তাৎপর্য নিরূপনই আমাদের লক্ষ্য, অতএব এ সম্পর্কে কোন অভিমত প্রকাশ এবং সেই অভিমতকে কারো উপরে চাপিয়ে দেয়া বা কারো ধর্মীয় বিশ্বাসে সামান্য তম আঘাত দেয়ার ইচ্ছা বা আগ্রহ আমাদের নেই—থাকতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই আমরা সহজ-সরল ভাবে অপরের কয়েকটি মাত্র অভিমতকে এখানে তুলে ধরলাম। সুধী পাঠকবর্গই স্বাধীন-ভাবে এসব অভিমতের সত্যতা ও সম্ভাব্যতা যাঁচাই করবেন।

মহাভারতের এই বিবরণ থেকে অন্য যে তথ্যটি জানতে পারা গিয়েছে পরিশেষে সেটিকে তুলে ধরেই অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি।

অভিধান থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, ধর্ম শব্দে যম, আত্মা, জীব, শিবের ষাঁড়, ঈশ্বর, বিষ্ণুর বক্ষস্থল থেকে উৎপন্ন এবং দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যাকে বিবাহকারী দেবতা প্রভৃতিকেও বোঝায়। মহাভারতের এই বিবরণ থেকে নতুন করে ''বকরূপী'' ধর্ম এবং তৎকর্তৃক পান্ডবদিগের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার কথাও আমরা জানতে পারলাম।

পুরাণের মতে ঃ

স্কন্দ পুরাণ (নাগর খন্ডম) ৪৪৪৫ পৃষ্ঠায় নীলগাই (নীল

www.pathagar.com

বর্ণের এক জাতীয় গাভী)-কে "চতুষ্পদ ধর্ম" বলা হয়েছে। শ্লোকটি বিরাট এবং তাতে নীলগাই-এর প্রসংশা সূচক বহু কথাই রয়েছে। বাহুল্য বোধে সেগুলো পরিহার করতঃ আমরা উক্ত গ্রন্থ থেকে বঙ্গানুবাদ সহ সংশ্লিষ্ট শ্লোকটির প্রয়োজনীয় অংশটুকু উদ্ধৃত করছি ঃ

গালব উবাচ.....

যোহ সৌ মহেশ্বরো দেবো বৃষশ্চাপি স এব হি

চতুষ্পাদো ধর্মরূপো-নীল ঃ পঞ্চমুখ হর ঃ।।

অর্থাৎ—এই লোহিত চিহ্নধারী নীল নামক বৃষ। এই লোহিত চিহ্নধারী নীল চতুষ্পদ ধর্মরূপী। নীল চতুষ্পদ-ধর্ম এবং নীলই পঞ্চমুখ হর (মহাদেব—লেখক)। উল্লেখ্য যে, 'চতুষ্পদ ধর্ম' বলতে এখানে পরিপূর্ণ বা ষোলআনা ধর্মকে বোঝানো হয়েছে।

অতএব ধর্ম বলতে যে নীল গাইকেও যে বোঝায় এই শ্লোক থেকে সেকথা আমরা জানতে পারলাম।

ব্যাকরণের মতে ঃ

অভিধান, মহাভারত এবং পুরাণ থেকে ধর্ম শব্দটির মোটামুটি তাৎপর্য জানতে পারা গেল। অতঃপর ব্যাকরণানুযায়ী এই তাৎপর্য জানার চেষ্টা করা হবে।

এজন্যে আমরা উক্ত অভিধানটির ধর্ম শব্দের এক এবং দুই চিহ্নিত বিবরণের শেষে উল্লেখিত সাংকেতিক চিহ্নগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করবো।

এগুলো যে ব্যাকরণে ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্ন সেকথা প্রায় সকলেরই জানা রয়েছে। বাঙলা ভাষার অভিধানে উল্লেখিত এই চিহ্ন গুলি যথাক্রমে—ধৃ+মন; বিঃ পুং বা ক্লী এবং ধৃ+মন্ কর্ত্তৃ। বিঃ পুং।

ধৃ+মন-এর তাৎপর্য হলো ঃ যা মনকে ধারণ করে বা ধরে রাখে। এথেকে বুঝতে পারা সহজ যে যেসব বিশ্বাস এবং আচারানুষ্ঠান-সমূহ সংস্কৃত ভাষাভাষী বিশেষ করে হিন্দুদিগের মনকে ধারণ করে বা ধরে রাখে যেগুলিকে সংক্ষেপে, সহজে এবং একটি মাত্র

www.pathagar.com

শব্দের মাধ্যমে অভিব্যক্ত করার জন্য সংস্কৃত ভাষার স্রষ্টারা সৃষ্টাগণ ধর্ম শব্দটির সৃষ্টি করেছিলেন।

দঃখের বিষয় "মনকে ধারণ করা বা ধরে রাখা" ধর্ম শব্দের এই তাৎপর্যকে নানা কারণে অনেকেই যথাযথ এবং গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না. এই কারণসমূহের কয়েকটি মাত্রকে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

০ বিশেষজ্ঞদিগের অভিমত থেকে ইতিপূর্বে আমরা জানতে পেরেছি যে এখন থেকে হাজার হাজার বছর পূর্বে সুদূরের সেই প্রাচীনকালে মানুষের মনে ধর্ম বিশ্বাসের সৃটি হয়েছিল। তদানিন্তন কালের ধর্মের ভূমিকা অর্থাৎ মানুষের মনকে ধারণ করা বা ধরে রাখার কাজে ধর্ম কতটা সফল হয়েছিল সে কথা আমরা জানিনা—জানা সম্ভবও নয়।

এর বহুকাল পরে যখন লেখ্য ভাষার উদ্ভাবন ও ধর্ম শব্দটির সৃষ্টি করা হয়–সে সময়ে মানুষের মনকে ধরে রাখার ধর্মীয় ভূমিকা কি ছিল এতকাল পরে সেকথাও সম্যকরূপে জানা সম্ভব হতে পারেনা।

তবে অতীব দুঃখজনক হলেও নিকট অতীতের ইতিহাস এবং বর্তমানের এ সম্পর্কীয় ঘটনা প্রবাহ আমাদের মনে ধর্মের এই ভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং এক ভয়াবহ চিত্রকেই প্রকট করে তোলে।

বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসীদিগের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘাত-সংঘর্ষ, নরহত্যা, নির্যাতন, অপরের অধিকারকে পদদলিত করন, এক-শ্রেণীর মানুষকে পশু অপেক্ষা হেয় প্রতিপন্নকরন, মানুষে মানুষে অপরিসীম ঘৃণা সৃষ্টি, মদ্যপাণ, জুয়াখেলা, ব্যভিচার প্রভৃতি এক কথায় ধর্মের নামে যাবতীয় অন্যায় অধর্মের তাণ্ডবতাই সেই চিত্রের মাঝে আমরা দেখতে পাই।

এ থেকে ধর্ম যে অন্ততঃ নিকট অতীতের মানুষদিগের মনকে ধরে রাখতে পারে নি সেকথা বলা ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা।

বর্তমানের আবস্থা তো আমাদের চোখের সম্মুখেই রয়েছে। গোটা পৃথিবীতে চোর, বাটপার, দাগাবাজ, অত্যাচারী, খুনী,

www.pathagar.com

মদ্যপায়ী ব্যাভিচারী উৎপীড়ক, হিংসুক, কপট প্রভৃতির সংখ্যা কত তা নিরূপণ করা কঠিন হতে পারে কিন্তু ধর্ম যে এদের মনকে ধরে রাখতে পারে নি সেকথা বুঝতে পারা মোটেই কঠিন নয়।

০ পৃথিবীর বহু দেশই যে ধর্মকে জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে বাদ দিয়ে উপাসনালয়ের মধ্যে বন্দী করত ঃ নিজেরা "ধর্মনিরপেক্ষ" সেজেছে সে দৃশ্যও আমাদের দৃষ্টির অগোচর নয়। বলা-বাহুল্য এদের মনকে ধরে রাখার বেলায়ও ধর্ম ব্যর্থ হয়েছে।

০ পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশ যে ধর্মকে "আফিং সদৃশ" "বুর্জোয়াদিগের শোষণের হাতিয়ার" "প্রগতির শত্রু" "বর্বরযুগীয় চিন্তার ফসল" প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করতঃ নিজ নিজ দেশ থেকে অতি নির্মমভাবে বিতাড়িত করেছে অতীব মর্মবেদনার সাথে সে দৃশ্যও আমরা অবলোকন করে চলেছি। ধর্ম যে এই কোটি কোটি মানুষের মনকে ধরে রাখতে পারে নি সেকথা বলাই বাহুল্য।

০ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতই উন্নতি অগ্রগতি সাধিত হয়ে চলেছে মানুষের মনও ততই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসহীন হয়ে পড়ছে, এই অবস্থা চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতেই অন্যান্য কতিপয় দেশের মতো গোটা বিশ্ব থেকেই ধর্মকে বিদায় নিতে হবে কিনা সে প্রশ্ন আজ প্রকট হয়ে উঠেছে।

এমতাবস্থায় "মানুষের মনকে ধরে রাখা" ধর্ম শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য কিনা অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ার পূর্বেই সেকথা ভেবে দেখা এবং যথাযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা অন্ততঃ প্রতিটি ধার্মিক ব্যক্তির পক্ষেই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে বলে আমর মনে করি।

০ ধর্ম কর্তৃক মানুষের মনকে ধরে রাখার জন্য যেসব উপায় অবলম্বিত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ ধর্মগ্রন্থ সমূহে পাওয়া যায় তাকে যথাযথ এবং যুক্তিগ্রাহ্য বলে স্বীকার করাও এক কঠিন ব্যাপার।

কেননা, ধর্ম একান্তরূপেই মনের কাজ। অতএর বিশ্বাসকে অতি অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্ত হতে হবে। ভয়-ভীতি বা লোভ-লালসা প্রদর্শণ

www.pathagar.com

কিংবা অন্য কোন ভাবে উপর থেকে জোর করে চাপিয়ে দেয়া বিশ্বাস-কে যে কপট বিশ্বাস এবং না বুঝে পুরুষানুক্রমিক ভাবে চলে আসা গতানুগতিক বিশ্বাস অর্থাৎ বিশ্বাস থাকার দাবীকে যে অন্ধবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারেনা জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রেরই সেকথা অবশ্যই জানা রয়েছে।

অথচ প্রায় প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই ধর্মকে মানা এবং না-মানার অঢেল পুরষ্কার এবং অপরিসীম শাস্তির যেসব বিবরণ নানা-ভাবে এবং নানা ভঙ্গীতে তুলে ধরা হয়েছে তাকে আর যা-ই হোক স্বতঃস্ফুর্ত বিশ্বাস সৃষ্টির প্রয়াস বলা যেতে পারে না।

অবশ্য ধর্মের কোন কল্যাণমূলক ভূমিকা নেই অথবা মানব সভ্যতায় তা কোন অবদান রাখে নি বা রাখতে সক্ষম নয় এতদ্বারা সেকথা আমরা বুঝাতে চাচ্ছিনা। আমরা শুধু একথাই বুঝাতে চাচ্ছি যে, "মানুষের মনকে ধারণ করা বা ধরে রাখা"-কে যদি ধর্মশব্দের সঠিক তাৎপর্য বলে আমরা গ্রহণ করি তবে ধর্মের এই ক্রমবর্ধমান ব্যর্থতার কারণ অতি অবশ্যই আমাদিগকে খুঁজে দেখতে হবে। আর এই তাৎপর্য সঠিক বলে প্রমাণিত না হলে আমাদিগকে অতি অবশ্যই তার সঠিক তাৎপর্য খুঁজে বের করতে হবে।

উক্ত অভিধানের এক চিহ্নিত বিবরণের শেষ ভাগে ধর্ম শব্দকে পুং বা ক্লীব লিঙ্গ বাচক এবং দুই চিহ্নিত বিবরণের শেষভাগে শুধু পুংলিঙ্গ বাচক শব্দ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

খুব সম্ভব যম, আত্মা, জীব, ঈশ্বর, বক, শিবের ষাঁড়, বিষ্ণুর বক্ষস্থল থেকে উৎপন্ন এবং দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যাকে বিবাহকারী দেবতা প্রভৃতিরা ধর্ম বলে আখ্যাত হওয়ার কারণে তাকে পুংলিঙ্গ-বাচক এবং ধর্ম শব্দে সুকৃত, শুভাদৃষ্ট, পুণ্য, রীতি প্রভৃতিকেও বুঝায় বলে ক্লীব লিঙ্গ বাচক বলা হয়েছে।

সবশেষে যে কথাটির প্রতি সর্বাধিক গুরত্ব আরোপ করত ঃ প্রসঙ্গের ইতি টানতে চাই সেকথাটি হলো ঃ

ধর্ম শব্দটির যাঁরা স্রষ্টা তাঁরা নিশ্চিত রূপেই তাঁদের নিজস্ব প্রয়োজন এবং পরিবেশ অনুযায়ী, তাঁদের নিজস্ব পরিমণ্ডলের জন্য এই শব্দটি সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং এই শব্দটি একান্ত

www.pathagar.com

রূপেই তাদের মন-মানস, ধারণা-বিশ্বাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং রুচিও স্বভাবের অনুকুল এবং একান্তরূপেই তাঁদের নিজস্ব।

কথাটিকে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, ধর্ম শব্দটি সৃষ্টি করার সময়ে যিনি বা যাঁরা সংস্কৃত ভাষা সৃষ্টি করেছেন সংস্কৃত ভাষা-ভাষী মানুষেরা যাতে সহজে সংক্ষেপে এবং সার্থকভাবে তাদের মনের ভাবকে প্রকাশ করতে পারে তিনি বা তাঁদের লক্ষ্য সে দিকেই কেন্দ্রীভূত ছিল; সে-সময়ে অন্য দেশের, অন্য ধর্মের বা অন্য ভাষা-ভাষী মানুষদিগের কথা চিন্তা করার সামান্যতম প্রয়োজনও তাঁরা অনুভব করেন নি।

যাঁরা ধর্ম সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন অতঃপর 'অভিমত' উপ-শিরোনাম দিয়ে তেমন কতিপয় প্রখ্যাত ব্যক্তির অভিমতকে তুলে ধরা যাচ্ছে।

অভিমত ঃ

০ বিশ্ববিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ফ্রেজারের মতে ধর্মের মূল উপাদান দুটি। একটি ঃ মানুষের চেয়ে উচ্চতর শক্তিতে বিশ্বাস; অন্যটি ঃ সেই অতি মানবিক শক্তির আরাধনা।

তিনি বলেন—ধর্মের জন্মের আগে যাদুবিদ্যার জন্ম হয়েছে এবং যাদুবিদ্যার ব্যর্থতা থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। তাঁর মতে জড়জগতের ধাতু যুগের আগে যেমন পাথর বা প্রস্তর যুগ তেমনি জ্ঞান জগতে ধর্মযুগের আগে যাদুবিদ্যার যুগ। তিনি যাদুবিদ্যার অনেক উদাহরণ দিয়েছেন। তার কতিপয় উদাহরণকে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে ঃ

রেড ইণ্ডিয়ানরা কাঠ দিয়ে শত্রুর প্রতিকৃতি তৈরী করে এবং তার বুকে বা মস্তকে সূচ বা তীরের ফলা ঢুকিয়ে দেয় এবং মনে করে যে সঙ্গে সঙ্গে শত্রু এই সূচ বা তীর ফোঁটানোর ব্যাথা অনুভব করছে।

তারা যদি শত্রুকে এইভাবে হত্যা করতে ইচ্ছা করে তাহলে মন্ত্রপাঠ করতঃ কাঠনির্মিত শত্রুর প্রতিকৃতিটিকে কঠোরভাবে আঘাত দেয় বা দ্বিখণ্ডিত করে এবং মনে করে যে, শত্রু নিহত হয়েছে।

www.pathagar.com

নিউ গিনির ওজোবালুক উপজাতীয়দের বিশ্বাস ঃ শত্রুর কম্বল পুড়িয়ে ফেললে কম্বলের সাথে সংশিল্ষ্ট শত্রুটি মারা পড়ে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় টানা অঞ্চলে যাদুকর শত্রুর অনিষ্ট সাধনের জন্যে শত্রুর পরিধেয় বস্ত্র সংগ্রহ করে এবং ঐ বস্ত্রটিকে ধীরে ধীরে আগুনে ঝলসাতে থাকে। তাদের বিশ্বাস এ কাজ করার সাথে সাথে সে মৃত্যু বরণ করেছে।

প্রুশিয়ার মানুষ চোরকে ধরতে না পারলে তার এক খানা কাপড় হস্তগত করতে চেষ্টা করে। চেষ্টা সফল হলে তারা কাপড়টিকে বেদম পিটাতে থাকে আর মনে করে যে এ কাজের ফলে চোর নিশ্চিত রূপেই ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আদিম মানুষদিগের বিশ্বাস বালি বা মাটিতে রচিত পদাঙ্কের উপরে শক্ত পদার্থ ফেললে পদাঙ্কটি যে ব্যক্তির সে নিশ্চিত রূপেই খোঁড়া হয়ে যায়।

কেউ যদি বাত-বেদনায় কষ্ট পেতে থাকে তবে সে বিশ্বাস করতে থাকে যে শত্রু তার পদ-চিহ্নের উপরে ভাঙ্গা কাঁচ ফেলেছে।

মোটকথা যাদুবিদ্যার প্রতি এই বিশ্বাস থেকেই মানুষ ধর্মের সৃষ্টি করে নিয়েছে বলে ফ্রেজারের ধারণা।

০ নৃ-বিজ্ঞানী পলরোদিনের অভিমত হলোঃ মানুষের অক্ষমতা ও ক্ষুদ্রতার অনুভূতি থেকেই ধর্মের জন্ম হয়েছে। তিনি মনে করেন ঃ আদিম মানুষদিগের মনে সুখ ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভের আকাঙ্খা ছিল কিন্তু তার পারিপার্শ্বিকের অশুভ ও বিরুদ্ধ শক্তি গুলো ছিল প্রবল এবং তার জ্ঞান এবং শক্তি ছিল সীমাবদ্ধ। ফলে বিরুদ্ধ শক্তিগুলোর মোকাবিলা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। অতএব নানাভাবে তাকে বিপন্ন ও পর্যুদস্ত হতে হতো।

এই অক্ষমতা ও তুচ্ছতার মনোভাব-প্রসূত-অনিরাপত্তা ও অশান্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার প্রয়োজনে আদিম মানুষ দুর্জ্ঞেয় ও ভীতিপ্রদ-অতি প্রাকৃত শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। বিরুদ্ধ শক্তিগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের সংবেদনশীল মনের প্রতিক্রিয়া থেকেই ধর্মের উৎপত্তি।

মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েডের মতে—সংবেদনশীল মনের প্রয়োজন থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন ঃ

www.pathagar.com

পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মধ্যে ধর্মের উৎপত্তির কারণ নিহিত রয়েছে। শিশুর মনে পিতার প্রতি যুগপৎ ভীতিও অনুরক্তি থাকতে দেখা যায়। এক দিকে শিশু যেমন পিতার কর্তৃত্বকে ভয় করে, অপর দিকে তেমনি পিতার প্রতি তার স্নেহ জনিত অনুরাগ থাকে।

পিতার প্রতি মনোভাব থেকেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধারণা সৃষ্টি হয়। পিতার প্রতি শিশুর মনোভাবই রূপান্তরিত হয় ঈশ্বরের কল্পনায়। পিতার মহত্তর প্রতিচ্ছবিই ঈশ্বর। পিতার মত ঈশ্বরের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব মানুষ পদে পদে অনুভব করে। আবার পিতার মত ঈশ্বর করুণাময় ও স্নেহশীল। মোটকথা ঈশ্বর পিতার নামান্তর। পিতার সঙ্গে ঈশ্বরের সাদৃশ্য থেকে ঈশ্বরের প্রতি মানুষের যুগপৎ ভীতি ও অনুরক্তি জন্মায়।

০ নৃবিজ্ঞানী টেলর বলেন ঃ আদিম মানুষ প্রথমে ভূত-প্রেত ও নিজনিজ মৃত পূর্বপুরুষদিগের পূজা করতো। পরে তাদের মধ্যে প্রকৃতিপূজার উন্মেষ ঘটে এবং নদী-নালা পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল, চাঁদ-তারা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুর পূজা শুরু হয়।

প্রকৃতিপূজা থেকে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় দেবদেবীর মূর্তিপূজার সৃষ্টি হয়। আদিম মানুষ প্রথমে অসংখ্য দেবদেবীর পূজা করতো। তারা ছিল বহুঈশ্বরবাদী। কালক্রমে তাদের মধ্যে পরমেশ্বরের ধারণার উদ্ভব হয় এবং সমাজে একেশ্বরবাদের আধিপত্য শুরু হয়।

নিজ নিজ পিতৃপুরুষের পূজা সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে টেলর যেসব তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরেছেন তার সংক্ষিপ্ত সার হলো ঃ মৃত্যুর পরে আত্মা প্রেতাত্মায় পরিণত হয়। আর এই প্রেতাত্মারা জীবিতদিগের জন্য নানা অঘটন ঘটায়। সুতরাং প্রেতাত্মাদিগকে সন্তুষ্ট রাখা দরকার। টেলর বলেন—এভাবেই মৃত পূর্বপুরুষদিগের প্রেতাত্মার পূজা শুরু হয় এবং ধর্ম জন্ম নেয়।

মোটকথা আত্মা, প্রেতাত্মা, ভূত-প্রেত প্রভৃতির ধারণা থেকেই যে ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে টেলর সেকথাই বুঝাতে চেয়েছেন।

০ ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী এমিল দুরখাইম মনে করেন ঃ

www.pathagar.com

আদিম ধর্ম সর্বতোভাবে সামাজিক ব্যাপার, ব্যক্তি পৃথক পৃথক ভাবে ধর্মকে উপলব্ধি করেনা, গোত্রের সদস্য হিসেবে ধর্মকে অনুভব করে। সমাজ বা গোত্রই ঈশ্বর। বিভিন্ন ধর্মীয় আচার পদ্ধতি সমাজকেই নিবেদন করা হয় এবং এইসব আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যক্তি গোত্রের কর্তৃত্ব অনুভব করে এবং স্বীকার করে। কাজেই ধর্ম সামাজিক একতার একমাত্র রক্ষা-কবচ।

০ প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী মেরেটের অভিমত হলো: আদিম মানুষের মনে আত্মা ও প্রেতাত্মার ধারণার উন্মেষের বহু পূর্বে ধর্মের ধারণার উন্মেষ হয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে অতি প্রাকৃত শক্তির ধারণার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে আত্মা ও প্রেতাত্মার ধারণার উদ্ভব হয়।

আদিম মানুষ যখন এমন কোনও বস্তুর সম্মুখীন হয়, যা অসাধারণ, যা সচরাচর দেখা যায় না, যাকে বোঝা যায় না, যাকে জানা যায় না; তখন আদিম মানুষের মনে সেই অতি প্রাকৃতের প্রতি ভীতি মিশ্রিত বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়।

এই ভীতি মিশ্রিত বিস্ময় থেকে তার মনে একটা নৈর্ব্যক্তিক দুর্জ্ঞেয় শক্তির ধারণা জন্মে এবং আদিম মানুষ ঐ অতিপ্রাকৃত বস্তুতে নৈর্ব্যক্তিক শক্তি আরোপ করে এবং তার সন্তুষ্টি বিধানে তৎপর হয়।

মেরেট মনে করেন—বস্তুর অন্তর্নিহিত নৈর্ব্যক্তিক শক্তির জন্য আদিম মানুষ সেই বস্তুকে পূজা দেয়,—তার আত্মা, তার ও প্রেতাত্মার জন্য নয়। আত্মা ও প্রেতাত্মার ধারণা আদিম মানুষের মনে অনেক পরে এসেছে। প্রথমে আদিম মানুষের মনে অতি-প্রাকৃতে ভীতি মিশ্রিত বিস্ময় থেকে নির্ব্যক্তিক শক্তির ধারণা জন্মে এবং যা কিছু লোকাতীত, যা কিছু জ্ঞান ও বুদ্ধির বাইরে তার মধ্যে সে একটা নৈর্ব্যক্তিক শক্তি আরোপ করে—তাকে পূজা করতে শুরু করে।

পরে কোন এক সময়ে আদিম মানুষের মধ্যে আত্মা ও প্রেতাত্মার ধারণার সৃষ্টি হয়।

মোটকথা, ভীতি মিশ্রিত বিস্ময় থেকেই যে আদিম সমাজে

www.pathagar.com

ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল মেরেট সেকথাই নানাভাবে বুঝাতে চেয়েছেন।

o *Living religion of the world* নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে *primitive paganism* এবং *Advanced paganism* উপ-শিরোনাম দিয়ে দুটি নিবন্ধ তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাভাষায় উক্ত শব্দ দ্বয়ের হুবহু প্রতিশব্দ যথাক্রমে 'আদিম বর্বরতা' এবং 'উন্নত বর্বরতা' কি না তা নির্ধারণের দায়িত্ব বিনয়ের সাথে যোগ্য ব্যক্তিদিগের প্রতি অর্পণ করছি।

উক্ত গ্রন্থের সুবিজ্ঞ লেখক বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণাদি দিয়ে আদিমানবদিগের যে চিত্র তুলে ধরেছেন অন্যান্য বিশেষজ্ঞদিগের এ সম্পর্কীয় অভিমতের সাথে তার হুবহু মিল রয়েছে। সুতরাং উদ্ধৃতি তুলে ধরার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

Advanced paganism যে *primitive paganism*-এরই সংস্কৃত বা ধোপদুরস্ত রূপ সেকথা সহজেই অনুমেয়। বিষয়টিকে আরো পরিস্কার করে বললে বলতে হয়ঃ

আজ এই বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষ সাধনের দাবী করা হচ্ছে তখন এই দাবীদারদিগের মধ্যে কেউ যদি আদিমানবদিগের অনুকরণে ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানবাদির প্রতি বিশ্বাস পোষণ ও উপাস্য জ্ঞানে তাদের এবং গাছ-বৃক্ষ, চন্দ্র-সূর্য, ইতর জীব-জন্তু প্রভৃতির পূজার্চনার কাজ চালিয়ে যান তবে সেটাকেই ইংরাজী ভাষায় *Advanced paganism* বলা হয়ে থাকে। বাংলা ভাষায় যার প্রতিশব্দ দাঁড়ায় উন্নত বর্বরতা।

দুঃখের বিষয়, ধর্মের এই সংস্কৃত বা ধোপদুরস্ত চেহারার অন্তরালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে সেই আদিম যুগ থেকে হাজার হাজার বছর ধর্ম নিয়ে এতকিছু করার পরেও ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ খোদ ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ই সম্ভব হয়ে উঠে নি।

বরং বলা যেতে পারে যে, তাঁর স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে তাঁকে রীতিমত বহুরূপী এবং কিম্ভূতকিমাকার বানানো হয়েছে।

www.pathagar.com

শুধু তা-ই নয় সাকারবাদ, নিরাকারবাদ, একত্ববাদ, দ্বিতত্ববাদ [১] ত্রিতত্ববাদ, [২] সর্বপ্রাণবাদ[৩] সর্বেশ্বরবাদ [৪] অহংবাদ [৫] সোহং-বাদ [৬] ব্রহ্মবাদ[৭], পৌত্তলিকতাবাদ, অবতারবাদ, মায়াবাদ, মোহবাদ, জড়বাদ, শূন্যবাদ লীলাবাদ, প্রেমবাদ, পিশাচবাদ প্রভৃতি বাদ সমূহের সৃষ্টি করতঃ প্রকৃত পক্ষে ধর্ম নামক বস্তুটাকেই বরবাদ করা হয়েছে।

ধর্মের প্রতি আজও যারা শ্রদ্ধাশীল রয়েছেন এমন ব্যক্তিদিগের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করতঃ উপসংহারে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতে চাই যে, অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্বের বাইরে চলে যাওয়ার পূর্বে দয়া করে আপনারা একটু সজাগ এবং সক্রিয় হয়ে উঠুন।

সকল প্রকারের গোঁড়ামী, অন্ধবিশ্বাস, কপটবিশ্বাস, কূপমণ্ডুকতা প্রভৃতি পরিহার করতঃ প্রকৃত ধর্ম কি অর্থাৎ ধর্মের স্বরূপ কি এবং কেমন হওয়া সঙ্গত ও স্বাভাবিক সর্বপ্রযত্নে এবং প্রজ্ঞাও বিশ্লেষণের সাথে সেকথা জানার চেষ্টা করুন।

হাজার হাজার বিশেষজ্ঞ যেভাবে ধর্মের উদ্ভব বা আদিম বর্বরতা (***Primitive paganism***)-এর চিত্র তুলে ধরছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাস কারী উপজাতীয় বলে পরিচিত কোটি কোটি মানুষ পুরুষা-নুক্রমে আজও গর্বের সাথে যেভাবে সেই আদিম বর্বরতাকে জীবন্ত রেখেছেন, অধিকাংশ ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে আজও গর্বের সাথে যেসব অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত এবং ভীষণভাবে অশ্লীল ও অবান্তর বিবরণ ও কল্প কাহিনীসমূহের প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সর্বোপরী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নতি-অগ্রগতি সাধনকারীদিগেরও কোন কোন শ্রেণীর মানুষেরা যেভাবে ***Advance paganism*** বা উন্নত বর্বরতায় ছদ্ম আবরণে সেই আদিম বর্বরতা বা ***primitive paganism***-কে শুধু গর্বের সাথে

---

১. পুরুষ ও প্রকৃতি
২. ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর
৩. জীবমাত্রই শিব বা প্রাণীমাত্রই ঈশ্বর
৪. এই বিশ্বের সবকিছুর মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজমান রয়েছেন।
৫. আমিই তিনি (ঈশ্বর)
৬. তিনিই আমি
৭. বিশ্বের সবকিছুই ব্রহ্মময়।

www.pathagar.com

টিকিয়েই রাখছেন না বরং এই টিকিয়ে রাখাকে ঐতিহ্যবাহী, গৌরব জনক এবং মহান সংস্কৃতির সেবা বলে অতীব ধুমধামের সাথে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন তা দেখে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে শুধু ধর্মকে পরিহারই করে নি-নিজ নিজ দেশ থেকে এমন কি গোটা পৃথিবীর বুক থেকে ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার এক দুর্জয় অভিযান শুরু করেছে।

শুধু তা-ই নয়—আমাদের অর্থাৎ ধর্মভীরু বলে বিশেষভাবে পরিচিত দেশসমূহের তরুণসমাজ বা আমাদের প্রাণপ্রিয় সন্তান সন্ততিদিগের অন্তরের খোঁজ-খবর নিলেও অতীব দুঃখ এবং হতাশার সাথে লক্ষ্য করা যাবে যে সেখানে কোথাও ধর্ম সম্পর্কে সীমাহীন অজ্ঞতা, উদাসীনতা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মের প্রতি অতি জঘন্য ধরণের ঘৃণা-বিদ্বেষ বিরাজমান রয়েছে।

তবে সুখের বিষয় অবস্থার এটাই সার্বিক চিত্র নয়; এর সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং আশাপ্রদ একটি দিকও রয়েছে, অতঃপর সেই দিকটির প্রতিই অলোকপাত করা হবে।

— ঃ —

www.pathagar.com

দীন (আদ্‌দীন) শব্দের তাৎপর্য

দীন (আদ্‌দীন) শব্দটি একটি বিশুদ্ধ আরবী শব্দ। এর ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য যেমন গভীর, তেমনই ব্যাপক এবং সুদূর প্রসারী। সুতরাং দু-চার কথায় এর তাৎপর্য তুলে ধরা সম্ভব নয়। তথাপি যত সংক্ষেপে সম্ভব আমরা এর তাৎপর্য তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ধর্মই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস পোষণ করতে বলে। তিনি যে অনাদি, অনন্ত, স্বয়ম্ভু, জন্মমৃত্যুহীন, সার্বভৌম ক্ষমতার একছত্র অধিপতি, অন্যনিরপেক্ষ, স্বয়ংসম্পূর্ণ, অভাবহীন, ত্রুটি ও অক্ষমতা বিমুক্ত, একমাত্র প্রভু, একমাত্র মালিক, সুতরাং আদেশ দাতা ও বিধান কর্তাও যে একমাত্র তিনিই এবং একমাত্র তাঁরই ইওয়া যে সম্ভব সেকথাও প্রায় প্রতিটি ধর্মেরই মূল কথা। কিন্তু প্রয়োগ বা কার্যক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্রই এর ব্যতিক্রম এমন কি বৈপরীত্যও পরিলক্ষিত হয়।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, তিনি অসীম অনন্ত বিধায় তাঁকে সম্যক রূপে জানা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব হতে পারেনা। চর্মচক্ষেও তাঁকে দেখা সম্ভব নয়।

অতএব তিনি যদি তাঁর পরিচয় যতটুকু সম্ভব বা যতটুকু প্রয়োজন যে কোন ভাবে মানুষকে জানিয়ে না দেন তবে তাঁর পরিচয় পাওয়ার আর কোন উপায়ই নেই।

বলাবাহুল্য; 'দীন'-এর প্রয়োজন এখানেই; কেননা দীনি বিধানের মাধ্যমেই তিনি মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় পথ-নির্দেশ সহ তাঁর নিজের পরিচয় যতটুকু মানুষের জন্য প্রয়োজন তুলে ধরেন।

আমরা যে শব্দটির তাৎপর্য এখানে তুলে ধরতে চাই উক্ত শব্দটির প্রথমে আলিফ এবং লাম সংযুক্ত করতঃ 'আদ্‌দীন' করা হয়েছে—'আদ্‌দীন' শব্দের অর্থ—একটি বিশেষ দীন বা একমাত্র দীন।

www.pathagar.com

ইসলামের দাবী হলো : আদি মানব থেকে শুরু করতঃ অসংখ্য বার্তাবাহকের মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ আদ্‌দীনের মূল কথাটি বিশ্বের সকল দেশের সকল মানব গোষ্ঠীর কাছে পেঁাছিয়ে দিয়েছেন। সেই মূল কথাটি হলো—"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" এর তাৎপর্য হলো : আল্লাহ ব্যতীত আর ইলাহ বা কোন উপাস্য নেই। ইলাহ বলতে বোঝায় প্রভু, মালিক, কর্তা, আদেশদাতা, বিধানদাতা, বিচারকর্তা, প্রতিফলদাতা বাঞ্ছাপূর্ণকারী, রক্ষাকর্তা, সাহায্যকারী প্রভৃতি গুণ ও যোগ্যতাসমূহের একমাত্র অধিকারী যিনি তিনিই ইলাহ।

অতএব এই মূলকথা (কালেমা)-টির প্রতি যারা সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করবে তারা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো কাছে সে রাজা, বাদশাহ, শাসক, দেবদেবী, নেতা, অত্যাচারী, উৎপীড়ক প্রভৃতি যা-ই হোক না কেন তার কাছে মাথা নত করবে না। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো আদেশ এবং আইন বা বিধান মানবে না। রক্ষাকর্তা, বাঞ্ছাপূর্ণকারী, প্রতিফলদাতা প্রভৃতি হওয়ার সামন্যতম যোগ্যতা এবং সামান্যতম অধিকারও অন্য কারো রয়েছে বলে স্বীকার ও বিশ্বাস করবে না। অন্য কথায় একমাত্র আল্লাহ্‌কেই চরম ও পরম প্রভু বলে স্বীকার করতঃ একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ রূপে আত্ম সমর্পন করবে।

পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে দীন (আদ্‌দীন) শব্দের তাৎপর্য :

যেহেতু দীন শব্দটি একটি বিশিষ্ট আরবী শব্দ অতএব পবিত্র কোরআন থেকে এর তাৎপর্য গ্রহণকে আমরা সর্বোত্তম ও সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য উপায় বলে মনে করি।

সেই কারণে পবিত্র কোরআনের যেসব আয়াতে উক্ত শব্দটি রয়েছে বিভিন্ন স্থান থেকে সেগুলোকে চয়ন করতঃ বঙ্গানুবাদসহ নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে আমরা উদ্ধৃত করবো এবং কোথায় উক্ত শব্দের কি তাৎপর্য গ্রহণ করা হয়েছে সেটাও গভীর ভাবে লক্ষ্য করে যাবো।

ক) ছুরত-আল ফাতিহায় "মালিকি ইয়াও মিদ্‌দীন" বলা হয়েছে; যার অর্থ বিচার দিবসের অধিপতি; কারণ যে-দিবসে সকলের সকল কাজের পরিপূর্ণ ও যথাযোগ্য প্রতিফল দেয়া হবে।

www.pathagar.com

খ) ছুরত-আছ্ছাফফাতে বলা হয়েছেঃ ওয়াকালু ইয়াওয়াই লানা হাযা ইয়াওমিদ্দীন; হাযা-ইয়াওমুল ফাছলিল্লাজী কুন্তুম বিহি তুকায্যিবুন (আঃ১৯) অর্থাৎ—তখন ইহারা বলিবেঃ হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য! ইহাতো বিচারের দিন—ইহা সেই ফয়ছালার দিন, যাহাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছিলে।

লক্ষ্যণীয় যে, এখানে ইয়াওমিদ্দীন কে "ইয়াওমিল ফছ্ল" বা বিচার ফায়ছালার দিন বলা হয়েছে। এভাবে উভয় শব্দকে এক সঙ্গে উল্লেখ করা এবং কি কারণে বিচার ফায়ছালার দিবসকে ইয়াওমিদ্দীন বলা হলো উক্ত সূরার ২০ ও ২১ আয়াতে তার বর্ণনা রয়েছে। উক্ত বর্ণনার সার-সংক্ষেপ হলো—যেহেতু সেদিন ছোট বড় সমুদয় সত্ত্বের দাবীদারদিগের সমুদয় সত্তব বিলীন হয়ে একমাত্র আল্লাহ্র সত্তব, প্রভুত্ব এবং আদেশাধিকার বলবৎ হবে অতএব উক্ত দিবসের নাম—ইয়াওমিদ্দীন।

গ) ছুরত আল-ইনফিতারে বলা হয়েছেঃ ওয়ামা আদরাকা মা ইয়াওমুদ্দীন,ছুম্মা মা আদরাকা মা ইয়াওমুদ্দীন, ইয়াওমা লা তামলিকু নাফ্ছুল্লি নাফ্ছিন্ শাইয়ান ওয়াল আম্রো ইয়াওমাযিন্ লিল্লাহ।—আঃ ১৬

অর্থাৎ—(হে নবী!) আপনি কি জানেন, সেই বিচারের দিনটি কি? হাঁ আপনি কি জানেন সেই বিচারের দিনটি কি? ইহা সেই দিন যখন কাহারো জন্য কিছু করার সাধ্য কাহারো হইবেনা, সেই দিন বিচার ফায়ছালার চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্র ইখতিয়ারেই হইবে।

মোটকথা দীন (আদ্দীন)-এর অন্তর্ভুক্ত প্রতিফল, হিসাব, শাসন, রাজত্ব, সত্ত্ব, প্রভুত্ব প্রভৃতি তাৎপর্যসমূহ রোজকিয়ামতের অর্থে বিদ্যমান থাকার কারণেই উক্ত দিবসকে 'ইয়াওমুদ্দীন' বলা হয়েছে।

ঘ) ছুরত আয্যারিয়াতে বলা হয়েছেঃ ইন্নামা তু আ'দুনা লাসাদিকুন, ওয়া ইন্নাদ্দীনা লা ওয়াকিউ'ন।—আঃ ৪/৫

অর্থাৎ—সত্য কথা এই যে তোমাদিগকে যে জিনিসের (কেয়ামতের) ভয় দেখানো হইতেছে উহা নিশ্চয়ই বাস্তব ও যথার্থ, দীন(আদ্দীন), বা কর্মের প্রতিফল অবশ্য অবশ্যই প্রদত্ত হইবে।

www.pathagar.com

কিয়ামত বা শেষ বিচার দিবসকে বুঝানোর জন্যই যে এখানে দীন (আদ্‌দীন) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আশাকরি সেকথা খুলে বলার প্রয়োজন হবেনা।

ঙ) ছুরত আল্‌ আন্‌আমে আল্লাহ তাঁর রসুল (সঃ)-কে আদেশ করেছেনঃ ক্বুল ইন্নানি হাদানি রাব্বি ইলা ছিরাতিম্‌ মোসতাকীমিন দীনান ক্বিয়ামা মিল্লাতা ইবরাহীমা হানিফা..... ।—আঃ ১৬১

অর্থাৎ হে নবী (সঃ) আপনি বলুন প্রত্যুত আমার রব্ব আমাকে সরল, সঠিক ও সুদৃঢ় পথের সন্ধান দিয়াছেন, সুদৃঢ় দীন হানীফ ইবরাহীম (আঃ)-এর মিল্লাৎ (আদর্শবাদী সমাজ)।

বলাবাহুল্য, এখানে মিল্লাৎ বা বিশেষ আদর্শে বিশ্বাসী একটি সমাজকে বুঝানোর জন্যে দীন (আদ্‌দীন) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

চ) ছুরত আল কাফিরুনে আল্লাহ্‌ তদীয় রসুলকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ ক্বুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন লা আ'বুদু মা তা' বুদুন, ওয়ালা আনতুম আবিদুনা মা' আবোদ, ওয়ালা আনা আ' বিদুম মা আ বাত্‌তুম, ওয়ালা আনতুন আ'বিদুনা মা আ'বুদ, লাকুম দীনুকুম ওলিয়া দীন।

অর্থাৎ—(হে রাসুল) আপনি বলুন হে অবিশ্বাসীর দল, তোমরা যাহার উপাসনা কর আমি তাহার উপাসনা করি না আর আমি যাঁহার উপাসনা করি তোমরা তাহার উপাসনা কর না। আর তোমরা যাহার উপাসনা স্বীকার করিয়াছ আমি তাহার উপাসনাকারী নহি, আর আমি যাহার উপাসনা করি তোমরা তাহার উপাসনাকারী নও, তোমাদের দীন তোমাদের জন্য আর আমার দীন(আদ্‌দীন) আমার জন্য।

বলাবাহুল্য, এখানে কর্মফল হিসেবে দীন (আদ্‌দীন) শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।

ছ) ছুরত ইউছুফে আল্লাহ আদেশ করেছেনঃ আমারা আল্লা তা' বোদু ইল্লা ইয়য়াহু, যালিকাদ্‌দীনুল ক্বাইয়্যেম ওলা কিন্‌না আকছা রান্নাছি লা ইয়া'লামুন।—আঃ ৩৯

অর্থাৎ—তাঁহার (আল্লাহ্‌র), নির্দেশ এই যে, স্বয়ং তাঁহাকে ছাড়া তোমরা আর কাহারই দাসত্ব ও উপাসনা করিবেনা, ইহাই সঠিক ও

www.pathagar.com

খাঁটি দীন (আদ্‌দীন) বা জীবন-বিধান. কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তাহা জানেন না।

এখানে যে দীন শব্দের দ্বারা আল্লাহ প্রদত্ত সঠিক ও খাঁটি জীবন বিধানকে বুঝানো হয়েছে সেকথা বলাই বাহুল্য।

জ) ছুরত আশ্‌শুরায় আল্লাহ বলেছেনঃ শারা আ'লাকুম্‌মিনা-দ্‌দীনি মা ওয়াছ্‌ছা বিহি নূহাও'ওয়াল্লাজী আওহায়না ইলাইকা ওয়া মা ওয়াছ্‌ছায় না বিহি ইবরাহীমা ওয়া মূসা ওয়া ঈসা আন্‌ আক্কীমুদ্‌দীনা ওয়ালা তাতাফার্‌রাকু ফীহি ·····।—আঃ ১২

অর্থাৎ—আর যাহা (যে শরীয়ত) (হে মুহাম্মদ!) এখন আপনার প্রতি আমরা অহীর সাহায্যে পাঠাইয়াছি। আর যাহার পথ-নির্দেশ আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে দিয়াছিলাম—এই তাকীদ সহ-কারে যে, কায়েম করুন এই দীনকে (আদ্‌দীন) এবং ইহাতে ছিন্ন ভিন্ন হইবেন না।

বলাবাহুল্য, এখানে শরীয়ত বা ব্যবহারিক নীতি নিয়মকে বুঝানোর জন্য 'দীন' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।

ঝ) ছুরত আল মু'মেন এ বলা হয়েছে ঃ ওয়া ক্বালা ফিরআউনো যারুনী আক্বতুল্‌ মূসা ওয়াল ইয়াদউ' রাব্‌বাহু ইন্নি আখাফু আঁইয়ুঁ্য বাদ্দিলা দীনাকুম আও আইঁউজ হিরা ফিল আরদিল ফাসাদা।—আঃ ২৫

অর্থাৎ—একদিন ফেরাউন তাহার দরবারের লোকদিগকে বলিল ঃ "আমাকে ছাড়, আমি এই মূসাকে হত্যা করিয়া ফেলি, সে তাহার আল্লাহ্‌কে ডাকিয়া দেখুক। আমার আশঙ্কা হয়, এই লোক তোমাদের দীনকে বদলাইয়া ফেলিবে কিংবা দেশে বিপর্যয় ডাকিয়া আনিবে।

এখানে যে দীন শব্দের দ্বারা ফেরাউনের রাজকীয় আইন বা রাষ্ট্রীয় বিধানকে বুঝানো হয়েছে সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখেনা।

ঞ) ছুরত ইউসুফ-এ বলা হয়েছে ঃ মাকানা লি ইয়াখুজা আখাহু ফী দীনিল মালিকি ইল্লা আঁইয়াশা আল্লাহ।—আঃ ৭৫

অর্থাৎ—(ইউসুফের পক্ষে) বাদশাহ্‌র দীন (মিসরের রাজকীয় আইন)-এর দ্বারা নিজের ভাইকে আটক করা তাহার জন্য শোভনীয়

www.pathagar.com

ছিল—অবশ্য যদি আল্লাহ্ই তাহা চাহেন সেকথা স্বতন্ত্র।

বলাবাহুল্য, এখানেও দীন শব্দের দ্বারা রাজকীয় আইন বা রাষ্ট্রীয় বিধানকে বুঝানো হয়েছে।

ট) ছুরত আশ শূরায় বলা হয়েছেঃ আম লা হুম শুরাকাউ শারাউ লাহুম্ মিনাদ্দীনি মা লাম ইয়া' যাম বিহিল্লাহ।—আঃ ২০

অর্থাৎ—ইহারা কি আল্লাহ্র এমন কিছু শরীক বানাইয়া লইয়াছে যাহারা ইহাদের জন্য দীন ধরনের কোন নিয়ম বিধান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে যাহার কোন অনুমতি আল্লাহ দেন নাই ?

বলাবাহুল্য, এখানেও মানব রচিত বিধান বা আইনকে বুঝানোর জন্য দীন শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।

ঠ) ছুরত আল বাকারাহ্তে বলা হয়েছেঃ ওয়া কাতিলু হুম হাত্তা লা তাকুনা ফিৎনাতুঁওয়া ইয়াকুনাদ দীনু লিল্লাহ।—আঃ ১৯২

অর্থাৎ—যতক্ষণ না ফেৎনা চূড়ান্তভাবে শেষ হইয়া যায় ও দীন (আদ্দীন) কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট হয়—তোমরা ততক্ষণ তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে থাক।

বলাবাহুল্য, এখানে প্রাধান্য (আল্লাহ্র প্রাধান্য) অর্থে (আদ্ দীন) শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

ড) ছুরত ইউছুফে বলা হয়েছেঃ ইনিল হুকমো ইল্লালিল্লাহ আমারা আল্লা-তা'বুদো ইল্লা ইয়াহু যালিকাদ্ দীনুল ক্বাইয়্যেম—।

—আঃ ৩৯

অর্থাৎ—তাঁহার নির্দেশ এই যে, স্বয়ং তাহাকে ছাড়া-তোমরা আর কাহারই দাসত্ব ও উপাসনা করিবেনা: ইহাই সঠিক ও খাঁটি দীন (আদ্দীন) বা জীবন-যাপন পন্থা।

এখানে যে প্রভুত্ব স্বীকার, আদেশ পালন ও উপাসনার-অর্থে-দীন (আদ্দীন) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অনায়াসেই সেকথা বুঝতে পারা যাচ্ছে।

ঢ) মৃত্যু-কালীন অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে,

ছুরত আল্ ওয়াকিআ তে বলা হয়েছেঃ ফালাওলা-ইন কুন্তুম গায়রা মা দীনিনা তারজিউনাহা-ইন কুন্তম সাদিক্বীন। আঃ ৮৫/৮৬

www.pathagar.com

অর্থাৎ—তোমরা যদি (আল্লাহ্‌র) দাস না হও তাহা হইলে (প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার পরে) উহাকে ফিরাইয়া আন, যদি তোমাদের (স্বাধীন হইবার) দাবী সঠিক হয়।

এখানে যে আল্লাহ্‌র দাসত্ব অর্থে-দীন (আদ্‌দীন) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেকথা অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে।

ণ) ছুরত আন্‌নিছায় বলা হয়েছেঃ ওয়া মান আহ্‌ছানু দীনাম্‌ মি ম্মান আছলামা ওয়াজহাহু লিল্লাহি ওয়াহুয়া মুহ্‌ছিনুঁ ওয়া ত্তাবায়া' মিল্লাতা ইবরাহীমা হানিফা ওয়াত্তাখাজাল্লাহু ইবরাহীমা খলিলা।—আঃ ১২৪

অর্থাৎ—বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া দিয়াছে ও নিজের জীবন যাত্রা সততা সহকারে সম্পন্ন করে এবং সম্পূর্ণ একমুখী ও একনিষ্ঠ হইয়া ইবরাহীমের পন্থা অনুসরণ করে—সেই ইবরাহীমের পন্থা যাহাকে আল্লাহ নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন——তাহার অপেক্ষা উত্তম দীন (আদ্‌দীন) বা উত্তম জীবন-যাপন-পন্থা আর কি হইতে পারে ?

বলাবাহুল্য, এখানেও দীন (আদ্‌দীন) শব্দের দ্বারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ আত্ম সমর্পন বা নির্ভেজাল আনুগত্য প্রকাশকে বুঝাচ্ছে।

ত) ছুরত আল আ'রাফে বলা হয়েছেঃ ক্বুল আমারা রাব্বি বিল ক্বিছ্‌তি ওয়া আক্বিমু ওয়াজু হাকুম ইনদা কুল্লি মাসজিদিওঁ ওয়াদ উ'হু মোখলিছিনা লাহুদ্‌দীন ·····।—আঃ ২৮

অর্থাৎ (হে মুহাম্মদ!) তাহাদিগকে বলুন—আমার আল্লাহ তো সুবিচারও সত্যতা-সততার হুকুম দিয়াছেন এবং তাঁহার হুকুম এই যে—প্রতিটি এবাদতে স্বীয় লক্ষ্য ঠিক রাখ, একমাত্র তাঁকেই ডাক, স্বীয় দীন (আদ্‌দীন)-কে একমাত্র তাহারই জন্য খালেছ ও নিষ্ঠাপূর্ণ কর।

বলাবাহুল্য, এখানে দীন (আদ্‌দীন)-শব্দের দ্বারা একমাত্র তাঁরই অর্চনা-উপাসনাকে বুঝানো হয়েছে।

উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহ থেকে দীন এবং আদ্‌দীন শব্দের

www.pathagar.com

যেসব তাৎপর্য জানতে পারা গেল আলোচনার সুবিধার জন্য সে-গুলোকে যথাক্রমে নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে ঃ

ক, খ, গ) শেষ বিচার বা প্রতিফল-দিবস—

ঘ) মিল্লৎ বা কোন বিশেষ আদর্শে বিশ্বাসী একটি দল বা সম্প্রদায়।

ঙ) কর্মফল

চ) আল্লাহ প্রদত্ত সঠিক ও খাঁটি জীবন বিধান।

ছ) আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়ত বা ব্যবহারিক আইন।

জ, ঝ, ঞ) রাজকীয় আইন বা মানব রচিত রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় বিধি বিধান,

ট) আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব—

ঠ, ড) প্রভুত্ব স্বীকার, আদেশ পালন ও উপাসনা,

ঢ, ণ, ত) আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ বা নির্ভেজাল আনুগত্য প্রকাশ ও একনিষ্ঠ উপাসনা-আরাধনা।

বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, উপরের এই উদ্ধৃতিসমূহ তুলে ধরার সময়ে—"দীন" এবং "আদ্‌দীন" এ দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও দীন শব্দের পরে বন্ধনীর মধ্যে আদ্‌দীন, কোথাও শুধু দীন আবার কোথাও শুধু আদ্‌-দীন শব্দ ব্যবহার করতে দেখে এর কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক।

বলাবাহুল্য, বিশেষ কারণেই এটা করতে হয়েছে। আর সে কারণটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সে সম্পর্কে সম্যকরূপে অবহিত না হতে পারলে বা ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকলে গোটা আলোচনাটা-ই সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যাবে। অতএব উক্ত কারণটি সম্পর্কে আলোকপাত করা যাচ্ছে।

আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই জানা রয়েছে যে—

'দীন শব্দটির পূর্বে আলিফ এবং লাম যোগ করতঃ আদ্‌দীন (الدين) করা হয়েছে। কোন ইংরাজী শব্দের পূর্বে *The* শব্দটি যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে কোন আরবী শব্দের পূর্বে সেই উদ্দেশ্যেই আলিফ ও লাম অক্ষর ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

ইংরাজীতে *Man* বললে যেমন যেকোন মানুষকে এবং *The man* বললে কোন বিশেষ বা নির্দিষ্ট মানুষকে বুঝায় আরবী ভাষায়ও ঠিক তেমনই দীন বললে যে-কোন আইন, বিধান, বিধি ব্যবস্থা, নীতি-নিয়ম ও প্রথা-পদ্ধতিকে বুঝায়; আর আদ্‌দীন (الدين) বলতে বুঝায় বিশেষ বা সুনির্দিষ্ট কোন আইন-বিধান, বিধি-ব্যবস্থা, নীতি-নিয়ম ও প্রথা-পদ্ধতিকে।

কথাটিকে আরো পরিস্কার করে বললে বলতে হয়ঃ উপরের জ ও ঝ চিহ্নিত আয়াত দ্বয়ে ফেরাউনের নাম দিয়ে বিশ্বের সকল রাজা-বাদশাহ, শাসক, দল, সংস্থা, প্রভৃতি কর্তৃক রচিত রাজকীয় আইন বা রাষ্ট্রীয় বিধানসমূহকে এবং "ঞ" চিহ্নিত আয়াতে মানব রচিত যাবতীয় ধর্মীয় বিধি-বিধান, নীতি-নিয়ম, ও প্রথা-পদ্ধতিকে দীন বলা হয়েছে এবং এই দীনের উল্লেখ করতে গিয়ে তার পূর্বে আলিফ লাম অক্ষর দ্বয়কে যুক্ত করা হয় নি।

পক্ষান্তরে অন্য আয়াতসমূহে যে দীনটির কথা বলা হয়েছে তা হলো বিশ্ববাসীর জন্য বিশ্বপতি আল্লাহ্‌র দেয়া একমাত্র দীন বা একমাত্র জীবন-বিধান। সেই কারণেই এই দীন শব্দের সাথে 'আলিফ-লাম' যুক্ত করতঃ অন্যান্য সকল দীন থেকে এটাকে পৃথক ও আল্লাহ্‌র দেয়া একমাত্র দীন বা জীবন-বিধানরূপে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

এতক্ষণ পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে দীন ও আদ্‌-দীন শব্দের ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যকে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর এই তাৎপর্যগুলি সমষ্টিগত ভাবে যেসব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে সেগুলিকে উদ্ধৃত করা যাছে ঃ

১) ছুরত আত্তওবায় বলা হয়েছেঃ ক্বাতিলুল্লাজীনা লা ইউমিনুনা বিল্লাহি ওয়ালা বিল ইয়াওমিল আখিরি ওয়ালা ইউহার্‌রিমুনা মা হার্‌রামাল্লাহ ওয়া রাসূলুহু ওয়ালা ইয়া দ্‌দীনুনা দীনিল হাক্কে.....।

অর্থাৎ—যাহারা আল্লাহ ও প্রতিফল দিবসের প্রতি বিশ্বাসী নয় এবং আল্লাহ ও তদীয় রসূল (সঃ) যাহা হারাম করিয়াছেন তাহাকে হারাম মনে করেনা এবং সত্যদীন (ইসলাম)-কে

www.pathagar.com

নিজেদের দীন (الدين) হিসাবে গ্রহণ করেনা তাহাদের সাথে সংগ্রাম করিতে থাক।

লক্ষ্যণীয় যে, এই আয়াতে আল্লাহ ও শেষবিচার বা প্রতিফল দিবসের প্রতি বিশ্বাস এবং তদীয় রসূলের বিধি-নিষেধের আনুগত্যকে দীন (আদ্-দীন) বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং তাকে দীনেহক্ক বা সত্যদীন বলা হয়েছে।

পুনশ্চ যারা উক্ত সত্যদীনের অনুসরণ করেনা বরং তার বিপরীত মতবাদ ও আচরণের অনুসরণ করে তাদের এই অনুসরণের কাজকেও দীন (ইয়াদ্দীনো) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে–, অর্থাৎ এই আয়াতে মানুষের অনুসৃত সর্বিধ সত্য, মিথ্যা মতবাদ ও আচরণকে দীন বলে অভিহিত করা হয়েছে।

২) ছুরত আল-ইম্রানে বলা হয়েছেঃ ইন্নাদ্দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম।

অর্থাৎ—আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র দীন (আদ্দীন-) হলো ইসলাম।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, সমষ্টিগত, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রভৃতি সকল পর্যায়ের জীবন পদ্ধতির নাম–ইসলাম। এখানে সেই ইসলামকেই দীন (আদ্দীন) বলা হয়েছে।

৩) উক্ত ছুরত-এর অন্যত্র (৮৩ আয়াত) বলা হয়েছেঃ আফা গায়রা দীনিল্লাহি ইয়াবগুণা ওয়ালাহু আসলামা মানফীস্সামা ওয়াতি ওয়াল আরদি তাওআ'ন ওয়া কারহান ওয়া ইলায়হি ইউরজাউ'ন।

অর্থাৎ—এখন এইসব লোক কি আল্লাহ্র আনুগত্য করার পন্থা (দীনিল্লাহ) পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন পন্থা গ্রহণ করিতে চাহে? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কিছুই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক আল্লাহ্রই নির্দেশের অধীন (মুসলিম) হইয়া আছে। আর মূলতঃ তাঁহারই দিকে সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

www.pathagar.com

৪) উপরোক্ত ছূরত-এর অন্যত্র (৮৫ আয়াত) বলা হয়েছেঃ ওয়া-মান ইয়াবতাগী গায়রাল ইসলামি দীনা (আদ্‌দীন) ফালাইং ইউক্ক-বালা মিনহু।

অর্থাৎ দীন ইসলাম (আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ আত্ম সম-র্পণ) ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোন দীন অবলম্বনকারী তাহার সেই দীন কে কোন অবস্থায়ই কবুল করা হইবে না এবং পরকালে সে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হইবে।

৫) ছূরত আল্‌ ফাত্‌হ-তে বলা হয়েছে ঃ হুআল্লাজী আরসালা রাসূলাহু বিলহুদা ওয়া দীনিল হাক্ক; লি ইউজহিরাহু আ'লা দীনি কুল্লিহী ওয়া কাফাবিল্লাহি শাহীদা।

অর্থাৎ-তিনি সেই আল্লাহ যিনি তাঁহার রসূলকে হেদায়াত ও সত্যদীন (আদ্‌দীন) সহকারে পাঠাইয়াছেন, (তিনি) যেন উহাকে সমগ্র (মানব রচিত) দীনের উপরে বিজয়ী করিয়া দিতে পারেন। আর এই মহাসত্য সম্পর্কে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

৬) ছূরত আন্‌নাস্‌র-এ বলা হয়েছে ঃ ইযা জায়া নাছরুল্লাহি ওয়াল ফাত্‌হু, ওয়ারা আয়তান্‌ নাছা ইয়াদ খুলুনা ফীদ্‌-দীনিল্লাহি আফ্‌ওয়াজা।

অর্থাৎ-যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসিবে ও বিজয় লাভ হইবে আর (হে নবী!) আপনি দেখিতে পাইবেন যে লোকেরা দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে (আদ্‌দীন) (ইসলামে) দাখিল হইতেছে।

বলাবাহুল্য, প্রথমোক্ত আয়াতসমূহের মতো শুধু বিচার, শাসন, প্রভুত্ব, দাসত্ব প্রভৃতিই নয় শেষোক্ত আয়াত কতিপয়ের মাধ্যমে দীন (دين) ও আদ্‌দীন (الدين) শব্দদ্বয়ের যাবতীয় তাৎপর্যকে সমষ্টিগত ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

ব্যাকরণ ও অভিধানের মতে দীন (আদ্‌দীন) শব্দের তাৎপর্য ঃ

সেমেটিক ভাষাসমূহে "দানা" ও "দীনুন" রূপে "দীন" শব্দের ধাতুরূপ বিদ্যমান রয়েছে। গোড়ার বিচার (Jugment), প্রতিদান ও প্রতিশোধ অর্থে এরা প্রয়োগ ছিল, পরে ব্যবস্থা ও সংবিধান অর্থে এটা ব্যবহৃত হতে থাকে।

www.pathagar.com

কেউ কেউ এ অনুমান ও করেন যে আরামাইক (*Aramic*) ভাষা থেকে এ শব্দটি প্রাচীন ইরানে স্থানান্তরিত হয় এবং পাহ্লভীতে আইন ও সংবিধান অর্থে 'দীনিয়া' শব্দের প্রচলন শুরু হয়।

আবেস্তার একাধিক স্থানে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যরদশ্তী-দের পুরাতন সাহিত্যে রচনা ও লিখনের নিয়মকে "দীনে দবীরা" বলে অভিহিত করা হয়েছে।

মেসোপটেমিয়ার জনৈক যরদশ্তী পণ্ডিত খ্রীষ্টিয় নবম শতকে "দীন কারত" নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। পবিত্র হাদীস, ফিকাহ শাস্ত্র, ব্যকরণ প্রভৃতি থেকে এ শব্দটির তাৎপর্য সম্পর্কে কতিপয় তথ্য নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে

১। সেমেটিক ভাষা হিসাবে আরবীতেও দীন (আদ্দীন) কর্ম ফল, ও প্রতিদান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২। ছহীহ্ বুখারী শরীফে একটি বক্তব্যের বঙ্গানুবাদ হলো— 'দীনা' প্রতিফলকে বলা হয়, ভাল কাজের হউক বা মন্দ কাজের। যেমন বলা হয়—"কামা-তদীনো তুদানো।" অর্থাৎ যে যেরূপ কার্য করিবে সে সেইরূপ প্রতিফল বা প্রতিদান পাইবে।

৩। মুখতারুছ্ছিহা ৫২৯ পৃষ্ঠায় জওহারীর বরাত দিয়ে যে বর্ণনাটি রয়েছে তার বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ ঃ

"দীনের অন্যতম অর্থ হইতেছে প্রতিদান ও কর্মফল। আরবীতে "দানহু—ইয়দীনহু দীনন-এর অর্থ ঃ তাহাকে প্রতিফল দিয়াছে। বলা হয়—"কাযা তদীনো তুদানো" যেরূপ আচরণ করিবে সেই রূপ প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে।

৪। মুফ্রদাতুল কোরআন (১৭৫ পৃঃ) মজ্মউলবিহার (৪৩১ পৃঃ) কামুছ (২২৫ পৃঃ) প্রভৃতিতে দীনের অন্যতম অর্থ "প্রতিফল" বলা হয়েছে।

৫। কামুছ (২২৫ পৃঃ)-এ দঈয়ানের অর্থ বলা হয়েছে—পরাক্রান্ত, বিচারক, আদেশকারী, শাসন কর্তা, হিসাব গ্রহণকারী, প্রতিফল দাতা, যিনি কোন আচরণকে ব্যর্থ করেন না বরং ভাল ও মন্দ উভয় বিষয় আচরণের যথাযোগ্য প্রতিফল প্রদান করেন।

www.pathagar.com

প্রতিফল দানের ভাব হতে দীনের দ্বিতীয় অর্থ করা হয়েছে—অনুগত করা, বাধ্য করা, বশীভূত করা, দাসে পরিণত করা।

পট্টনী বলেন, "দানন্ নাছা" বাক্যের অর্থ হইল—তাহাদিগকে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করিল। "দিন্ তোহুম ফ-দানু-অর্থাৎ তাহাদিগকে আমি পর্যুদস্ত করিলাম এবং তাহারা আনুগত্য স্বীকার করিল।

ফিরোজাবাদী বলেন, দাইয়ানাহু বাক্যের অর্থ হইল-যে কাজের জন্য সে সম্মত ছিলনা, তাহা করিবার জন্য তাহাকে বাধ্য করিল এবং তাহাকে পর্যুদস্ত করিল।

ইমাম রাগিবও এই অর্থ কোরআনের শব্দকোষে উল্লেখ করিয়াছেন। দীনের উপরিউক্ত অর্থ সূত্রে দাসকে 'মদীন' আর দাসীকে 'মদীনা' বলা হইয়াছে। কারণ দাসত্ব তাহাদের বশীভূত হওয়ার কারণ।[১]

৭। হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়—রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর পিতৃব্য আবু তালিবকে বলেছিলেন—আমি কুরাইশগণের কাছে শুধু একটি "স্বীকারোক্তি" চাই, যার ফলে সমস্ত আরব অনুগত ও বশীভূত (ওদীনো) হয়ে যাবে।

এই হাদীসে আনুগত্য ও বশ্যতার জন্য দীন (আদ্‌দীন) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।[২]

বলা আবশ্যক যে, বিচার করা ও প্রতিফল দেয়ার জন্য তা পুরষ্কার বা তিরষ্কার যে আকারেই হোক না কেন অনুগত করা, বশ্যতা স্বীকার করানো উপযুক্ত ভাবে পুরষ্কৃত করণ এবং সমুচিত দণ্ড দেয়ার মতো শক্তি ও বিক্রম আবশ্যক। যার এরূপ শক্তি ও বিক্রম নাই তাকে প্রকৃত পক্ষে বিচারক ও প্রতিফল দাতা বলা যেতে পারেনা।

সুতরাং দীনের (আদ্‌দীন) অন্যতম অর্থ "প্রতিফল দান" থেকে বাধ্য, বশীভূত ও দাসে পরিণত করার অর্থ গৃহীত হয়েছে এবং পরে স্বতন্ত্রভাবে এই অর্থেই দীন (আদ্‌দীন) ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

---

১. মুখ্‌তার ৫২৯ পৃঃ মজ্‌মউল বিহার (১) ৫০১ পৃঃ মুফ্‌রদাতুল কোরআন ১৭৫ পৃঃ কামুছ (৪) ২২৫ পৃঃ

২. মজমউল বিহার (১) ৪৩১ পৃঃ

www.pathagar.com

৮। অভিধানে দীন (আদ্-দীন) শব্দের নিম্নলিখিত অর্থ-গুলি লিখিত রয়েছে ঃ

হিসাব, পরাক্রম, প্রভাব, প্রাধান্য, শাসন, রাজ্য, সংবিধান, চরিত্র, কৌশল, তওহীদ (একত্ববাদ) এবং যে সকল উপায় অবলম্বন করতঃ আল্লাহ্র ইবাদত করা হয় তৎসমস্তই দীন (আদ্-দীন)।[১]

৯। দীনের অন্যতম অর্থ—আনুগত্য, 'দানালাহু' বাক্যের অর্থ ঃ সে তাহার অনুগত হইল—এই অর্থসূত্রে দীনের বহুবচন আদ্ইয়ান।[২]

১০। অভিধান অনুযায়ী "দানালাহু"—'দীন্ তোলাহু'—'দীনতুহু' বাক্যত্রয়ের অর্থ—আমি তাহার সেবা করিলাম।[৩]

১১। দীনের অন্যতম অর্থ ঃ—অভ্যাস, অবস্থা ও আচার, যেমন বলা হয়—ইহাই আমার 'দীন' অর্থাৎ—অভ্যাস।[৪]

১২। মানুষ যে আচার ও রীতি প্রতিপালন করিয়া থাকে তাহাও দীন।[৫]

১৩। হাদীসে কথিত আছে ঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহার স্বগোত্রের 'দীন' প্রতিপালন করিলে, অর্থাৎ—হজ্জ, বিবাহ, ক্রয় বিক্রয় এবং রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয়ে—তাহাদের বিধি-ব্যবস্থার অনুসরণ করিতেন।

মোটকথা, আভিধানিকভাবে দীন শব্দ যে সকল অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তন্মধ্যে প্রতিফল, অভ্যাস, আনুগত্য অন্যতম। অতীত কালের ক্রিয়াপদে 'দানা' শব্দের অর্থ হবে—সে তাকে বশীভূত করেছে, দাসে পরিণত করেছে, তার অধিকারী হয়েছে, তাকে শাসন করেছে।[৬]

---

১. কামুছ (৪) ২২৫ পৃঃ (৪) মুখতার ৫২৯ পৃঃ, কামুছ (৪) ২২৫ পৃঃ, পৃঃ, ২. মুখতার ৫২৯ পৃঃ ৩. কামুছ ৪. ২২৫ পৃঃ ৫. লিছানুল আরবী (১৭) ২৯ পৃঃ ৬. তর্জুমানুল হাদীস ২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা থেকে এর অধিকাংশ তথ্য গৃহীত হলো।

www.pathagar.com

দীন ও শরিয়ত ঃ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে দীন (আদ্-দীন)-এর মূল হলো—'লা-ই লাহা ইল্লাল্লাহ'। অর্থাৎ—আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই। অন্য কথায় বলা যেতে পারে ঃ আল্লাহ শুধু এই বিশ্বের স্রষ্টা-ই নন, প্রতিপালক, পরিপোষক, সংস্থাপক, ব্যবস্থাপক প্রভৃতিও একমাত্র তিনিই। অসীম, অনন্ত, সর্বশক্তিমান সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি, সর্বজ্ঞ এবং সর্বদর্শীও তিনিই।

অতএব, এই বিশ্বের প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব এবং মালিকানার যোগ্যতা এবং অধিকার একমাত্র তাঁরই রয়েছে। যিনি প্রভু, কর্তা এবং মালিক একমাত্র তিনি-ই যে আদেশ-দাতা, বিধান-দাতা, বিচারক ও প্রতিফল-দাতা হতে পারেন, অন্য কারো যে এসব কাজের সামান্যতম অধিকারও থাকতে পারেনা সেকথা বলাইবাহুল্য। আর এসব গুণ যোগ্যতা এবং অধিকার যার রয়েছে একমাত্র তিনি-ই যে ইলাহ বা উপাস্য হতে পারেন সে সম্পর্কেও দ্বিমতের কোন অবকাশ থাকতে পারেনা।

এই একক সত্তার প্রতি অটল ও অবিচল বিশ্বাস এবং একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণই হলো দীন (আদ্-দীন)-এর মূলকথা, আর এই মূল কথারই সংক্ষিপ্ত সার হলো—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর এই দীন (আদ্-দীন) বা এই পবিত্র কালেমার বাস্তবায়ন কিভাবে হতে পারে তার বিষদ বিবরণ ও বিস্তারিত পথ-নির্দেশ রয়েছে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের গ্রন্থসমূহে। এই হিসাবে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের গ্রন্থসমূহকে দীন (আদ্-দীন)-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা বলা যেতে পারে।

আবহমান কাল যাবত মানুষ বিশ্বপ্রভুর এসব যোগ্যতা এবং অধিকারের কথা জেনে এসেছে, মুখে মুখে স্বীকারও করেছে অথচ কাজের বেলায় রাজশক্তি, শাসক, গুরু-পুরোহিত, পুতুল-প্রতিমা, ইতর জীব-জন্তু, বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদার্থ ও কল্পিত শক্তি, ভুত-প্রেত, মৃত পূর্বপুরুষ, নেতা, বিভিন্ন ইজম, জাতীয়তা, অর্থ

www.pathagar.com

বিত্ত, সুনাম সুযশ, প্রবৃত্তি প্রভৃতিকে প্রভু বা ইলাহ হিসেবে স্থান দিয়ে তাদের আনুগত্য ও উপাসনা করেছে।

অতীব দুঃখের বিষয় তারা মুখে মুখে বিশ্বপ্রভুকে জন্ম-মৃত্যু-হীন, অযোনি সম্ভব, চিন্ময়, সচ্চিদানন্দ, অজড়, অমর, প্রভৃতি বলে স্বীকার করেছে কিন্তু কাজের বেলায় অবতার হিসেবে মৎস, কচ্ছপ, শূকর, মানুষ প্রভৃতি রূপে তাঁর জন্ম গ্রহণ ও মৃত্যু বরণের কথা বিশ্বাস করেছে।

তাঁকে অসীম, অনন্ত, সর্বপ্রদাতা, সর্বশক্তিমান বলে মুখে মুখে স্বীকৃতি দিয়েও তারা দাতা, বাঞ্ছাপূর্ণকারী, শান্তি দাতা, ত্রাণকর্তা, দুঃখ নিবারক প্রভৃতি রূপে অসংখ্য দেব দেবী, সিদ্ধ পুরুষ এবং অশরীরী শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করতঃ তাদের আনুগত্য ও উপাসনায় আত্মনিয়োগ করেছে, এবং এমন ভাবেই পৃথিবীতে সর্বেশ্বরবাদ, অহংবাদ, সোহংবাদ, অংশবাদ, প্রেতবাদ, পিশাচবাদ, প্রভৃতি সর্বনাশবাদ গুলির সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।[১]

কোন কোন দেশে এই ধরনের ইলাহ বা উপাস্যের সংখ্যা তেত্রিশ কোটিতে উপনীত হয়েছে বলে জানতে পারা যায়। উপাস্যের এই বিপুল সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উপাসকদিগের মধ্যে মতভেদ ও কোন্দলের সৃষ্টি হয়েছে, পরস্পর বিবদমান অসংখ্য দল উপদল গড়ে উঠেছে, ঘৃণা বিদ্বেষ ও রক্তক্ষয়ী সংঘাত-সংঘর্ষে পুনঃ পুনঃ এই পৃথিবীর মাটি ও আকাশ বাতাস বিষাক্ত ও বেদনার্ত হয়ে উঠেছে।

বলাবাহুল্য, মানব জাতিকে এই অসংখ্য ইলাহ্‌র অভিশাপ থেকে রক্ষা করার জন্যই দীন (আদ্-দীন) এর মহান শিক্ষা নিয়ে যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর কাছে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব ঘটেছে।

তাঁরা নিজ নিজ পরিমণ্ডলভুক্ত মানুষদিগকে দীন (আদ্‌দীন) এর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, তদনুযায়ী চলার প্রেরণা ও পথ নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিজেদের চরিত্র দ্বারা তাদের সম্মুখে নমুনা বা আদর্শ স্থাপন করেছেন।

---

১. এই পুস্তকের Primitive paganism এবং advanced paganism সম্পর্কীয় আলোচনা এ সম্পর্কে বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

কিন্তু তাঁদের তিরোধানের পরে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস এবং উপরোল্লেখিত নকল ইলাহসমূহের দাপট ও চক্রান্ত আবার মানুষদিগকে বিভ্রান্তির সাগরে নিক্ষেপ করেছে।

দীন (আদ্-দীন) সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবও এ জন্যে মোটেই কম দায়ী নয়। সে কারণে অতঃপর দীন (আদ্-দীন) সম্পর্কে যাতে কোন ভুল বুঝাবুঝি না থাকে সে জন্য দুকথা বলতে হচ্ছে। তবে এজন্যে আমাদের নিজের কথায় নয় অন্ততঃ এই উপমহাদেশের প্রখ্যাত ও সর্বজনমান্য আলেম, বাগ্মী এবং বহু গ্রন্থ-প্রণেতা মওলানা মোঃ আবুল কালাম আযাদ-এর এ সম্পর্কীয় অভি-মতকে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ উম্মুল কোরআন থেকে নিম্নে হুবহু তুলে ধরা যাচ্ছে ঃ

"কুরআন বলে, ধর্মের মতানৈক্য দুই ধরনের। এক তো ধর্মানুসারীরা মূল শিক্ষা ভুলিয়া গিয়া সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় আদপেই ধর্মের বিধি বিধানের ব্যাপারে একটি অপরটির সহিত বিভিন্নতা রাখে। যেমন, উপাসনা পদ্ধতি সব ধর্মের এক নহে। বস্তুতঃ এই দুই ধরনের পার্থক্যের প্রথমটি তো ধর্মের নহে, ধর্মানুসারীর; আর দ্বিতীয় পার্থক্যটি মূল ধর্মের নহে—শাখা প্রশাখার, অন্তরের নহে—বাহিরের। এরূপ পার্থক্য থাকার প্রয়োজন ছিল।

কুরআন বলে, ধর্মের শিক্ষার দুইটি দিক, একতো ধর্মের প্রাণ-শক্তি। দ্বিতীয় হইল ধর্মের বাহ্যিক রূপ। প্রথমটি হইল মূল, দ্বিতীয়টি শাখা। প্রথমটিকেই 'দীন' বলা হয়, দ্বিতীয়টি 'শরা'।

এইটিকে 'নুছুক' এবং 'মিনহাজ'ও বলা হয়। 'শরা' ও মিনহাজ অর্থ পথ এবং নুছুক অর্থ উপাসনা পদ্ধতি। তারপর শরা' পরিভাষারূপে ধর্মীয় বিধি-বিধান অর্থে ব্যবহৃত হইল আর নুছুক ইবাদত অর্থে ব্যবহৃত হইল।

ধর্মের ভিতরে পার্থক্য যতটুকু দেখা যায় তাহা দীন বা মত ও মতবাদের নহে; বরং পথ ও পদ্ধতির, অর্থাৎ স্বরূপে নহে—রূপে, ইহার দরকার ছিল। কারণ ধর্মের উদ্দেশ্য মানব জাতির সঠিক কল্যাণ দান ও সংশোধন। অথচ সকল যুগের সব মানুষের অবস্থা

www.pathagar.com

ও প্রয়োজন একরূপ ছিল না। এক এক যুগের মানুষের জীবন ও জীবিকা চিন্তা ও কর্ম এক এক রূপ দেখা দিত। সব কালের মানুষের প্রকৃতিও এক ছিলনা।

সুতরাং সেইযুগে যেরূপ পরিবেশে সেই ধর্ম আত্ম প্রকাশ করিল, পথ ও পদ্ধতি সেই অনুসারে প্রদত্ত হইল। সুতরাং প্রত্যেকটি ধর্ম উহার নির্দিষ্ট সীমা রেখায় যথাযথই ছিল। তাহা ছাড়া মানুষের ধারাবাহিক ধারায় স্থান ও কালের প্রভাবে যত বৈচিত্র্য ও পার্থক্য দেখা দিয়াছে, সেই তুলনায় ধর্মের এই বাহ্যিক পার্থক্য আদৌ গুরুত্ব রাখেনা।"

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় মওলানা পবিত্র কোরআনের একটি বাণী তুলে ধরেছেন, যার হুবহু বঙ্গানুবাদ হলো :

"অর্থাৎ হে রসুল ! আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই ইবাদতের এক বিশেষ পদ্ধতি রাখিয়াছি। তাহারা সেই সব পথে চলিতেছে। সুতরাং তোমার সহিত তাহাদের ঝগড়া করা উচিত নহে। তুমি তাহাদিগকে তাহাদের এক প্রভুর দিকে ডাক, নিশ্চয়ই তুমি সঠিক পথে রহিয়াছ।"

দীন (আদ্‌দীন) এবং শরীয়ত সম্পর্কে এতক্ষণ যে-সবকথা বলা হলো এবং যে-সব তথ্য প্রমাণাদি তুলে ধরা হলো আশা করি তা থেকেই মোটামুটি একটা ধারণায় উপণীত হওয়া সম্ভব হবে।

তবে বিষয়টি খুবই জটিল, গুরুত্বপূর্ণ এবং দীর্ঘদিন যাবত এ নিয়ে যথেষ্ট ভুল বুঝাবুঝি বিদ্যমান রয়েছে বিধায় সাধারণ মানুষ-দিগের মধ্যে এর পরেও কিছুটা বিভ্রান্তি থেকে যেতে পারে। অতএব আরো সহজে বিষয়টিকে বুঝানোর চেষ্টা করা যাচ্ছে।

দীন (আদ্‌দীন) এবং শরীয়ত এই উভয় মিলেই ইসলাম। একটি প্রাণ, অন্যটি দেহ বা একটি মূল—অন্যটি সেই মূলে উপনীত হওয়ার পথ-পদ্ধতি এবং উপায় উপকরণ।

আদিমানব থেকে শুরু করতঃ যুগে যুগে পৃথিবীর মানব সম্প্রদায় গুলির কাছে তাদের নিজ নিজ ভাষায় এই দীন (আদ্‌দীন) এর শিক্ষা ও আদর্শ নিয়ে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে।

www.pathagar.com

তাঁরা যুগের চাহিদা, স্থানীয় প্রয়োজন এবং তত্রৈত্য অধিবাসী-দিগের মেধা ও গ্রহণ-যোগ্যতানুযায়ী নিজ নিজ পরিমণ্ডলভূক্ত মানুষদিগকে দীন (আদ্-দীন)-এর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এবং আদর্শ স্থাপন করতঃ তাদের মনে প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন ও পথ-নির্দেশ দিয়েছেন।

যেহেতু নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মাঝে এবং স্থানীয় প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে দীন (আদ্-দীন)-এর আহ্বান জানানোই এসব মহাপুরুষ-দিগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল অতএব তাদের বয়ে আনা দীন (আদ্-দীন) পূর্ণাঙ্গ, সার্বজনীন ও সর্বকালীন ছিলনা।

পরিশেষে বিশ্বের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাব ঘটে এবং তাঁর মাধ্যমে এই দীন (আদ্-দীন)-কে পূর্ণাঙ্গ, সার্বজনীন ও সর্বকালীন দীন (আদ্-দীন) বা জীবন বিধান রূপে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

এই ব্যবস্থার সাথে প্রাকৃতিক নিয়মের একটা ঘনিষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আমরা জানি, প্রতিটি মানব শিশুকেই প্রাকৃতিক নিয়মে শৈশব, বাল্য, কৈশোর প্রভৃতি পর্যায় গুলিকে একে একে অতিক্রম করতঃ যৌবনে উপণীত বা পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হতে হয়। এর ব্যতিক্রম করার সাধ্য কারো নেই।

শৈশবের মন-মানস, খাদ্যাখাদ্য, পোষক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, আবেগ-অনুরাগ প্রভৃতি বলতে গেলে প্রায় সব কিছুই বাল্য এবং কৈশোরে বয়সের অনুপযোগী এবং অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ায় তা পরিত্যক্ত বা পরিবর্তিত হয়; যৌবনে এসে সব কিছুরই একটা স্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি হয়।

যতদূর জানা যায়, মানব জাতিকেও এমনি ভাবে জাতি হিসেবে শৈশব, বাল্য, কৈশোর প্রভৃতি পর্যায় গুলো একে একে অতিক্রম করতঃ বর্তমান অবস্থায় উপনীত হতে হয়েছে।

একথাও আমাদের অজানা নয় যে পৃথিবীর সকল দেশ একই সময়ে এবং একই সঙ্গে উন্নত অগ্রসর হয়ে উঠে নি, উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মিশর ইরাক প্রভৃতি দেশ যখন উন্নতির শিখরে উঠেছে ইউরোপে তখনো প্রস্তরযুগ চলেছে।

www.pathagar.com

বলাবাহুল্য, সেই কারণেই যুগের চাহিদা, স্থানীয় প্রয়োজন এবং অধিবাসীদিগের মেধা ও গ্রহণ-যোগ্যতার সাথে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে দীন (আদ্-দীন)-এর শিক্ষা প্রবর্তিত হয়ে এসেছে। এবং জাতি হিসেবে যৌবনে পদার্পণ করার পরে যখন সর্বত্র প্রায় স্থিতিশীল অবস্থা গড়ে উঠেছে তখন পূর্ণাঙ্গ, সার্বজনীন ও সর্বকালীন দীন (আদ্-দীন) বা জীবন বিধানের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন বিশ্বের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

পূর্বে একথাও বলা হয়েছে যে দীন (আদ্-দীন) ও শরীয়ত এ উভয় মিলেই-ইসলাম। আদিমানব থেকে শেষ নবী (সঃ) পর্যন্ত বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মহাপুরুষের প্রচারিত দীন (আদ্দীন) এক, অভিন্ন এবং অপরিবর্তনীয় ছিল এবং থাকবে। কিন্তু শরীয়ত যেমন খাদ্যা-খাদ্য, পোষাক পরিচ্ছদ, বিবাহ, উপসনা-প্রণালী প্রভৃতি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। বলাবাহুল্য, দেশ ও পরিবেশের ভিন্নতার কারণে এই ভিন্নতাই ছিল স্বাভাবিক।

অথচ অতীব দুঃখ ও ক্ষোভের সাথে বলতে হয় যে, অনেক পন্ডিত ব্যক্তিও দীন (আদ্-দীন) ও শরীয়তকে অভিন্ন ও একাকার বলে ধরে নিয়ে ভয়ানক ধরনের হট্টগোল, বিসৃংখলা এমন কি পরস্পরের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সৃষ্টি করেছেন এবং এটাকেই ধার্মিকতার পরাকাষ্ঠা বলে মহা ধুমধামের সাথে চালিয়ে যাচ্ছেন।

অতীব দুঃখের বিষয় অবস্থা এখানে এসেই থেমে যায় নি, কেউ কেউ শরীয়ত কেই দীন (আদ্-দীন) বলে ধরে নিয়ে প্রবলভাবে শরীয়তের চর্চা ও পরিচর্যা চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে প্রাণশক্তি হারিয়ে দীন (আদ্-দীন) আজ প্রাণহীন অনুষ্ঠানে বা অনুষ্ঠান সবস্বে পরিণত হয়েছে।

এ থেকে কেউ যদি মনে করেন যে, আমরা শরীয়তের গুরুত্বকে খাটো করে দেখছি তবে তিনি প্রচণ্ড ভুল করবেন। আমরা পূর্বেই বলেছি—দীন (আদ্দীন) হলো মূল, আর শরীয়ত সেই মূলে উপনীত হওয়ার পথ পদ্ধতি ও উপায় উপকরণ। বিষয়টিকে আরো সহজে বুঝানোর জন্যে সেখানে আমরা দীন (আদ্-দীন)-কে প্রাণ এবং শরীয়তকে দেহ বলেও উল্লেখ করেছি।

www.pathagar.com

পথ-পদ্ধতি এবং উপায় উপকরণ ছাড়া মূলে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে মূল এবং পথ পদ্ধতি ও উপায় উপকরণ এক এবং একাকার হয়ে যেতে পারেনা।

অনুরূপভাবে দেহ ছাড়া প্রাণ এবং প্রাণ ছাড়া দেহ চলতে পারে না। কিন্তু প্রাণ রক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে দেহের অপারেশন ও অঙ্গ-চ্ছেদ করা যেতে পারে এমন কি অনেক সময়ে তা অপরিহার্য ও বিবেচিত হয়ে থাকে, কিন্তু দেহ রক্ষার জন্য প্রাণের অপারেশন বা প্রাণ বিসর্জন সম্ভব হতে পারে না।

এ থেকে বুঝতে পারা সহজ যে এতদ্বারা আমরা শরীয়তকে খাটো করে দেখা নয় বরং দীন (আদ্-দীন) ও শরীয়ত এ উভয়ের গুরুত্ব এবং মর্যাদাকে সঠিক ও যথাযথভাবে উপলব্ধি করারই অনু-রোধ জানাচ্ছি।

বিষয়টিকে আরো সহজে বুঝানো এবং ভুল বুঝাবুঝির অব-সান ঘটানোর জন্য একটি মাত্র উদাহরণই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। উদাহরণটি হলো—আমাদের নামায।

নামাযের সময়ে কেউ কেউ বুকের উপরে হাত বাঁধেন, কেউবা বাঁধেন নাভীর নীচে আবার কেউ কেউ হাত বাঁধেন-ই না। এনিয়ে পারস্পরিক কোন্দল এমন কি মারামারি মামলা মোকদ্দমা সংঘটিত হওয়ার ঘটনাও বিরল নয়।

তারা ভুলে যান যে, এখানে আসল উদ্দেশ্য হলো (আল্লাহ্র ভাষায়) 'সালাত ক্বায়েম করা'—আমরা অন্ততঃ এই উপমহাদেশের মুসলমানেরা যাকে 'নামায পড়া' বলে থাকি। যদিও এ উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে।

সে যা হোক, সালাত ক্বায়েম করা বা নামায পড়াটা-ই হলো আসল উদ্দেশ্য; আর নামাযের উদ্দেশ্য হলো—আল্লাহ্র ভাষায় —সকল প্রকারের অন্যায়, অশ্লীলতা, আল্লাহ্র আদেশের অনানুগত্য, অন্যায় বিদ্রোহ প্রভৃতিকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতঃ নিজেকে এবং নিজদিগকে খাঁটি, একনিষ্ঠ ও ঐক্যবদ্ধ মানুষ বা মুসলমান রূপে গড়ে তোলা।

অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, সালাত এমনই একটি অনুষ্ঠান যার যথাযথ অনুশীলন দ্বারা আল্লাহ্ভীরু, ন্যায়নিষ্ঠ, ঐক্যবদ্ধ,

www.pathagar.com

সুশৃংখল, নিয়মানুবর্তী, চরিত্রবান তথা বিশ্ববাসীর জন্য আদর্শ ও অনুকরনীয় একটি সমাজ গড়ে তোলা একান্তরূপেই সম্ভব। আর সালাত ক্বায়েমের উদ্দেশ্যও এটাই।

"সালাত ক্বায়েম করা" এবং "নামায পড়া" এ দুয়ের তাৎপর্য অনুধাবন করা হলেই আমরা কত বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছি তার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে।

এবারে নিয়ম কানুনের কথায় আসা যাক; নামায পড়ার যে সব নিয়ম কানুন (শরীয়তের বিধান) রয়েছে হাত বাঁধা সেগুলোর অন্যতম। অতএব একথা বুঝতে পারা মোটেই কঠিন নয় যে, আমরা নামায পড়ার জন্য হাত বাঁধি; হাত বাঁধার জন্য নামায পড়িনা।

অথচ নামায নিয়ে কোন কোন্দল আমাদের মধ্যে নেই; যত কোন্দল আর মনোমালিন্য সব কিছুই হাতবাধা এবং এমনি ধরনের গুরুত্বহীন ও খুটিনাটি বিষয় গুলো নিয়ে।

অনেকের কাছে শ্রুতিকটু এবং পীড়াদায়ক হলেও সত্যের খাতিরে না বলে পারা যাচ্ছেনা যে, যেদিন থেকে আমরা নিজেদের ইচ্ছায় 'সালাত ক্বায়েম করা, ছেড়ে 'নামায পড়া' শুরু করেছি সেদিন থেকেই অনুষ্ঠিতব্য কাজটি অন্তর ছেড়ে মুখের কাজে পরিণত হয়েছে, অতঃপর দীন (আদ্‌দীন)-এর বাকি কাজ গুলিও ধীরে ধীরে বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ তথা প্রাণহীন অনুষ্ঠান বা অনুষ্ঠান সর্বস্বে পরিণত হয়েছে।

এ কথা শুধু কোন এক দেশ বা কোন এক সম্প্রদায়ের জন্যই প্রযোজ্য নহে; পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করণে দেখা যাবে যে যেখানেই দীন (আদ্‌-দীন)-এর মূলকে বাদ দিয়ে পথ পদ্ধতি ও আচারানুষ্ঠানাদি নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে সেখানেই দীন (আদ্‌-দীন) সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকলাপই প্রাণহীন অনুষ্ঠান অন্য কথায় একটা নির্মম প্রহসনে পর্যবসিত হয়েছে। আশা করি বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখা হবে এবং প্রকৃত দীন (আদ্‌-দীন)কে জীবনের সকল স্তরে প্রতিষ্ঠাদানের সাধনায় সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করা হবে।

www.pathagar.com

রিলিজিয়ন (Religion)

বলাবাহুল্য, 'রিলিজিয়ন' একটি বিশিষ্ট ইংরাজী শব্দ। অভিধানের মতে এ শব্দটির তাৎপর্য ঃ

Human recognition of a Personal God entitled to obedience ; any system of faith and worship ; a monastic life.

পূর্বেই বলা হয়েছে—ভাষা ভাবের বাহন। অতএব রিলিজিয়ন শব্দটি দ্বারা ইংরাজ জাতি এবং ইংরাজী ভাষাভাষী মানুষদিগের মনে যে ভাবের সৃষ্টি হয় অভিধান লেখক উপরের এই শব্দ বা বাক্য তিনটিকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করতঃ তা অভিব্যক্ত করেছেন।

মানব জীবনে পরিবেশের প্রভাব কত প্রচণ্ড ইতিপূর্বে বহু যুক্তি-প্রমাণ সহকারে তা তুলে ধরা হয়েছে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার একমাত্র না হলেও অন্যতম প্রধান কারণ যে এই পরিবেশের প্রভাব সেখানে সেকথাও বলা হয়েছে।

মোটকথা, অন্যান্য ভাষার মতো ইংরাজী ভাষার বেলায়ও যে ইংরাজী ভাষাভাষী মানুষদিগের পরিবেশ, প্রয়োজন, সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতির উপরে ভিত্তি করে এবং একান্তরূপেই তাদের মনের ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়েই ইংরাজী ভাষায় সৃষ্টি করা হয়েছে এতদ্বারা সে কথাই আমরা বুঝাতে চাচ্ছি।

ইংরাজী ভাষা যে, একান্তরূপেই ইংরাজ জাতি এবং ইংরাজী ভাষাভাষী মানুষদিগের নিজস্ব সে সম্পর্কেও দ্বিমতের কোন অবকাশ আছে বলে আমরা মনে করিনা।

কথাটিকে আরো সহজে বুঝানোর জন্য আমাদের অর্থাৎ বাংলাদেশী এবং বাংলা ভাষাভাষী মানুষদিগের উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। বাংলা ভাষা একান্তরূপেই আমাদের নিজস্ব, এ আমাদের মাতৃভাষা, প্রাণের ভাষা, মনের ভাষা; এই ভাষার জন্য আমাদের প্রাণপ্রিয় যুবকেরা অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। এই ভাষার

www.pathagar.com

পরিবর্তে অন্য ভাষাকে আপন বা নিজস্ব বলে আমরা মেনে নিতে পারিনা বলেই দুর্জয় ভাষা আন্দোলন গড়ে' উঠেছিল।

সে যা হোক, এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে ইংরাজী ভাষা আজ আন্তর্জাতিক মর্যাদা পেয়েছে একথা সত্য, কিন্তু এই ভাষার উদ্ভাবকেরা যখন এই ভাষার উদ্ভাবন করেছিলেন তখন তাঁরা শুধু ইংরাজী ভাষাভাষী মানুষদিগের জন্যই এটা করেছিলেন, অন্য কারো কথা চিন্তা করার সুযোগ, প্রয়োজন এবং পরিবেশ তখন ছিলনা।

একথা বুঝতে পারা মোটেই কঠিন নয় যে, নিজস্ব ভাষা হিসেবে সাধারণ ও অসাধারণ নির্বিশেষে ইংরাজী ভাষাভাষী মানুষেরা “রিলি[illegible] শব্দটি শ্রুতিগোচর হওয়ার সাথে সাথে যত সহজে এবং [illegible] তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন অন্য পরিবেশে বসবাসকারী এবং অন্য ভাষাভাষী সর্বসাধারণ মানুষদিগের পক্ষে যথাযোগ্য বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া কোন ক্রমেই তা সম্ভব হতে পারে না।

অতএব এই শ্রেণীর মানুষদিগের কাছে অভিধানে বর্ণিত তাৎপর্যকে সহজবোধ্য করে তোলার জন্য কিছুটা বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।

আলোচনার সুবিধার জন্য অতঃপর পৃথক পৃথক উপ-শিরোনাম দিয়ে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে এই বিচার বিশ্লেষণের কাজ চালিয়ে যাওয়া হবে।

ধর্মীয় স্বাধীনতা ঃ

অভিধান থেকে উদ্ধৃত ইংরাজী ভাষার বাক্য তিনটির মোটামুটি সারমর্ম হলো—আনুগত্য লাভের অধিকারী 'গড্'কে ব্যক্তিগত স্বীকৃতি প্রদান, যে কোন ধরনের বিশ্বাস ও উপাসনা এবং সন্যাসকে রিলিজিয়ন বলা হয়ে থাকে।

লক্ষ্যণীয় যে, উক্ত বাক্যত্রয়ের একস্থানে গড্কে *Personal* বা ব্যক্তিগত বলা হয়েছে। এই ব্যক্তিগত বলার তাৎপর্য হলো ঃ এ ব্যাপারে সবাই স্বাধীন। অর্থাৎ যার ইচ্ছা গড্কে স্বীকৃতি দিতে পারে আবার না-ও দিতে পারে। এই স্বীকৃতি দেয়া বা

www.pathagar.com

না দেয়ার ব্যাপারে অন্য কারো 'টু শব্দটি' করারও অধিকার নেই। বিভিন্ন কারণে এ ধরনের স্বাধীনতা সমর্থন যোগ্য হতে পারেনা বলে আমরা মনে করি। এই কারণগুলির কতিপয়কে নিম্নে তুলে ধরা যাছে ঃ

০ গড্ যে এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা, প্রভু, প্রতিপালক, সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি সে সম্পর্কে বিশ্বের প্রায় সকল ধর্মীয় বিধানই ঐক্যমত পোষণ করে। আবহমান কাল ধরে ভাষা, বর্ণ, গোত্র প্রভৃতি নির্বিশেষে বিশ্বের আপামর জনসাধারণও গড্ বা বিশ্বপ্রভু সম্পর্কে অনুরূপ বিশ্বাসই পোষণ করে চলেছে।

এমতাবস্থায় অর্থাৎ যিনি বিশ্বপ্রভু কেউ তাকে প্রভু বলে স্বীকার করবে আবার কেউ স্বীকার করবে না, এটা বাস্তব-সম্মত এবং যুক্তি-গ্রাহ্য হতে পারেনা।

০ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ধর্মীয় বিধানই নিজেকে বিশ্বপ্রভুর নিকট থেকে সমাগত বলে দাবী করে। সঙ্গে সঙ্গে এ দাবীও করে যে, বিশ্বপ্রভু যে-বিধানানুযায়ী মানুষকে পরিচালিত করতে চান বা যে-বিধানানুযায়ী পরিচালিত হলে মানুষের জন্য ইহ-পরকালের প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণ সুনিশ্চিত হতে পারে ধর্মীয় বিধানে তারই পথ-নির্দেশ রয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে "বিধানদাতা" বলেই বিশ্ব-প্রভুর একটি নাম "বিধাতা"।

এ থেকে বুঝতে পারা সহজ যে, যে ব্যক্তি গড্ বা বিশ্বপ্রভুর অস্তিত্ব বা প্রভুত্ব স্বীকার করেনা ধর্মীয়বিধানের সাথে তার কোন সম্পর্কই থাকতে পারেনা।

ব্যক্তি স্বধীনতার অর্থ যদি এ-ই হয় যে, যার ইচ্ছা সে গড্ এবং তার বিধানকে মেনে চলবে আর যার ইচ্ছা সে মেনে চলবে না; তা হলে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী দুটি দল গড়ে উঠবে এবং শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তাকে ভীষণ-ভাবে বিঘ্নসংকুল করে তুলবে।

০ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ধর্মীয় বিধানেরই মূল কেন্দ্রবিন্দু হলেন গড্ বা বিশ্বপ্রভু। প্রভু হিসেবে আদেশ, নির্দেশ বা বিধি-বিধান দেয়ার অধিকার এবং যোগ্যতা একমাত্র তাঁরই থাকতে পারে।

www.pathagar.com

মানব জাতিকে তিনি কোন্ পথে চালাতে চান বা কোন্ পথে চললে মানুষ ইহ-পরকালে প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণ লাভ করতে পারে তারই প্রেরণা ও পথ-নির্দেশ ধর্মীয় বিধানে রয়েছে বলে গভীরভাবে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে।

এমতাবস্থায় কেউ যদি ধর্মীয় বিধান মেনে না চলেন তবে জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য তাঁকে অবশ্যই নিজের জ্ঞান বুদ্ধি অথবা কোন নেতা বা সংস্থা-সংগঠন কর্তৃক উদ্ভাবিত নীতি-নিয়ম বা পথ-পদ্ধতি মেনে চলতে হয়।

বলাবাহুল্য, এমনি ধরনের ব্যক্তি স্বাধীনতার ফলে স্বেচ্ছাচারিতার কুফল ভোগ করতে হয় অথবা নানা মুনির "নানা মতে"র গোলক ধাঁধায় পড়ে হাবুডুবু খেয়ে মরতে হয়।

o বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ধর্মীয় বিধানেরই লক্ষ্য হলো অন্ততঃ তাদের নিজ নিজ অনুসারীদিগের মধ্যে ঐক্য, সংহতি, সৌহার্দ, মানবতাবোধ, প্রেম, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি সৃষ্টির মাধ্যমে একটি ঐক্যবদ্ধ ও আদর্শবাদী সমাজ গড়ে তোলা।

এমতাবস্থায় কেউ গড্ এবং তাঁর বিধানকে মেনে চলবে আর কেউ স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী জীবন বেছে নেবে এটা দ্বারা আর যা-ই হোক কোন শান্তিপূর্ণ, ঐক্যবদ্ধ ও আদর্শবাদী সমাজ গড়ে উঠতে পারে না।

o অভিধান লেখক গড্কে স্বীকার ও বিশ্বাস করার কাজটিকে *Personal* বা ব্যক্তিগত বলেছেন। কিন্তু ইতিপূর্বে ধর্ম ও দীন শব্দের আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে উভয়েই এই স্বীকার ও বিশ্বাস করাকে ব্যক্তি এবং সমষ্টি এই উভয় পর্যায়েই বাধ্যতা-মূলক বলে ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ যিনি বিশ্বপ্রভু তাঁকে স্বীকার ও বিশ্বাস করা প্রত্যেকের এবং সকলের জন্যই বাধ্যতা-মূলক অন্ততঃ তাই সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, গড্ শুধু *Personal* বা ব্যক্তিগতই নন-তিনি সমষ্টিগতও।

o তবে একটি কারণে এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকাকে আমরা শুধু সঙ্গত বলেই মনে করিনা অপরিহার্য বলেও মনে করি। সেই কারণটি হলো ঃ

www.pathagar.com

o o o

আমরা জানি গড্, রিলিজিয়ন প্রভৃতি একান্ত রূপেই বিশ্বাসের বিষয়; আর কোন কিছুর প্রতি বিশ্বাস করা বা না করাটা হলো একান্তরূপেই মনের কাজ। বিশ্বাসকে অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্ত হতে হয়। কেননা উপর থেকে মনের উপরে জোর করে চাপিয়ে দেয়া বিশ্বাসকে কপট-বিশ্বাস অথবা অন্ধবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না। এ উভয় ধরনের বিশ্বাসই যে, মানবতার পক্ষে ভীষণভাবে জঘণ্য ও ক্ষতিকর তার বহু বাস্তব প্রমাণ আমাদের চোখের সম্মুখেই রয়েছে, অতএব এ উভয়ের কোনটাই মানুষের কাম্য হতে পারেনা।

সেই কারণে আমরা মনে করি যে, পৃথিবীতে বহু ধর্মীয় বিধান চালু রয়েছে। মানুষের উচিত স্বাধীনভাবে এবং নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে সেগুলো যাঁচাই-বাছাই করা, এবং সেগুলোর মধ্যে যে টির প্রতি মনে স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাসের সৃষ্টি হয় সেটিকে গ্রহণ করা। অতএব এই যাঁচাই বাছাই এবং গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অবশ্যই থাকতে হবে। অন্যথায় স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাস সৃষ্টি হতে পারেনা—হওয়া সম্ভবই নয়। ফলে গড্ডলিকা প্রবাহের মতো কপটবিশ্বাসী অথবা অন্ধবিশ্বাসী হয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দিতে হয়।

অথচ রিলিজিয়ন বলতে যে ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা উপরোক্ত অভিধানের ভাষায় বলা হয়েছে তা বল্গাহীন স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারীতা। অতএব কোন ক্রমেই তা সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

রিলিজিয়ন অনুযায়ী যারা এই স্বাধীনতা ভোগ করে চলেছেন তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক অবস্থা পর্যালোচন করা হলেই এই বল্গাহীন স্বাধীনতার কুফল কত সাংঘাতিক হতে পারে তার বাস্তব ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে বলে আশা করি।

এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। আগ্রহী পাঠকবর্গ নিজেরা বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে এই ব্যক্তি স্বাধীনতার কুফল সম্পর্কে আরো অনেক তথ্যই খুঁজে পাবেন।

o অভিধানের দ্বিতীয় বাক্যটিতে ***Any system of faith and***

www.pathagar.com

worship বা যে-কোন ধরনের বিশ্বাস ও উপাসনাকে রিলিজিয়ন বলা হয়েছে।

আমরা জানি, পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অসংখ্য মতবাদ বিদ্যমান রয়েছে। এসবের প্রতি বিশ্বাস পোষণকারী মানুষও রয়েছে। অথচ এই মতবাদসমূহের সব গুলিই সত্য, অভ্রান্ত এবং কল্যাণকর নয়।

কালের প্রবাহে এবং অন্যান্য কারণে এসব মতবাদের অনেক গুলিই যে বিকৃত, অতি রঞ্জিত, ক্ষতিগ্রস্থ এবং যুগের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে তার জাজ্জল্যমান প্রমাণও আমাদের অনেকের কাছেই রয়েছে।

মানুষে মানুষে যত বিভেদ-বৈষম্য, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা-অবহেলা, রক্তক্ষয়ী সংঘাত-সংঘর্ষ চালু রয়েছে তার অধিকাংশের জন্যই যে এই ভিন্ন ভিন্ন এবং বিকৃত ও অতি রঞ্জিত মতবাদসমূহই দায়ী সেকথা নিষ্ঠুর হতে পারে, কিন্তু মিথ্যা নয়।

o অনুরূপভাবে *Worship* বা উপাসনার বেলায়ও দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসীদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন এক দুই তিন বা বহু সংখ্যক উপাস্য এবং ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি চালু রয়েছে। এই সব ভিন্ন ভিন্ন উপাস্যের মধ্যে ভুত-প্রেত, পুতুল-প্রতিমা, গাছ-বৃক্ষ, জন্তু-জানোয়ার, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতিও রয়েছে।

এমতাবস্থায় সকল উপাস্য ও সকল প্রকারের উপাসনাকে রিলিজিয়নের অন্তর্ভূক্ত না করে বরং খোদ রিলিজিয়নই যদি আসল উপাস্য এবং আসল উপাসনা পদ্ধতির সন্ধান ও পথ নির্দেশ দিয়ে এ সম্পর্কীয় যাবতীয় ভুল-ভ্রান্তির অবসান ঘটাতো তবে সেটা-ই সঙ্গত ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ হতো বলে জ্ঞানী-গুণী ও চিন্তাশীল মহল মনে করেন। অথচ তা না করে *"any system of faith and worship"* বলে পাইকারীভাবে সত্য-মিথ্যা সকল উপাস্য ও সকল ধরনের উপাসনাকে রিলিজিয়নের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

o শেষ বা তৃতীয় বাক্যটি দ্বারা সন্যাসকেও রিলিজিয়নের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আমরা জানি একদিকে মানুষের মধ্যে লোভ-লালসাদির প্রবল উত্তেজনা রয়েছে আর অন্যদিকে পৃথিবীতে

www.pathagar.com

ছড়ানো রয়েছে ভোগ ও বিলাসের অফুরন্ত উপাদান ও তার প্রচণ্ড হাতছানি।

এই অবস্থায় আত্ম সংযমের জন্য বৈরাগ্য বা সন্যাসের প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু বৈরাগ্য বা সন্যাস নামে যা চালু রয়েছে এবং সন্যাস বলতে আমরা যা বুঝতে অভ্যস্থ হয়েছি বিশেষ করে রিলিজিয়ন ভুক্ত মানুষদিগের মধ্যে যে ধরনের সন্ন্যাস আমরা দেখতে পাই তাকে উদ্ভট, অবাস্তব এবং মানবতা বিরোধী ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারেনা।

এ নিয়ে আর দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। কেননা বৈরাগ্যবাদ বা সন্যাসের নামে বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সমাজে যা চালু রয়েছে তার পরিচয় এত প্রকট ও প্রত্যক্ষ যে, নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজনই হয় না।

মৌলিকতা সংরক্ষণ ঃ

ধর্ম, দীন ও আদ্‌দীন শব্দ ত্রয় যে, যথাক্রমে বেদ ও কোরআনের শব্দ ইতিপূর্বে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা পেয়েছি। পৃথিবীর যেসব বিধান নিজেকে স্বয়ং বিশ্ববিধাতার নিকট থেকে অবতীর্ণ হওয়ার দাবী করে থাকে এ গ্রন্থ দুটি যে সেগুলোর অন্যতম আশা করি, সে-কথা সকলেরই জানা রয়েছে।

স্বয়ং বিশ্ববিধাতা প্রদত্ত বিধানের কোন রূপ সংশোধন সংযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধনাদির যোগ্যতা এবং অধিকার যে কোন মানুষের থাকেনা—থাকতে পারেনা সেকথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না।

রিলিজিয়ন শব্দটি যে ইংরাজী ভাষার একটি বিশেষ শব্দ ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই সেকথা জানা রয়েছে। এই শব্দটি যে গ্রন্থে রয়েছে সে গ্রন্থটির নাম "বাইবেল"। বাইবেলও বিশ্ববিধাতার নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে বলে দাবী করা হয়ে থাকে। অথচ বিশ্ববিধাতার নিকট থেকে ইংরাজী ভাষায় কোন বিধান অবতীর্ণ হওয়ার একটি প্রমাণও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। অধুনা কোন কোন প্রচার-পত্রে বাইবেলের পরিবর্তে "ইঞ্জিল শরীফ" নামটি লিখিত থাকতে দেখা যায়।

www.pathagar.com

হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাধ্যমে ইঞ্জিল নামক গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে বলে প্রকৃষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। যতদূর জানা যায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর ভাষা ছিল সুরিয়ানী। অতএব ইঞ্জিল নামক গ্রন্থ খানা যে, সুরিয়ানী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল নিশ্চিত রূপেই সে-কথা আমরা ধরে নিতে পারি। এমতাবস্থায় বাইবেলকেও ইঞ্জিলের ইংরাজী অনুবাদ বলে ধরে নিতে হয়।

কিন্তু অসুবিধা হলো অনুবাদ দ্বারা মূল গ্রন্থের তাৎপর্য নির্ণয় কোনক্রমেই সম্ভব হতে পারেনা। তা ছাড়া কারণ যা-ই হোক সুরিয়ানী ভাষায় লিখিত আসল ইঞ্জিল আজ পৃথিবীর কুত্রাপি খুঁজে পাওয়া যায়না, আর উক্ত ভাষাও আজ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

যতদূর জানা যায় প্রথমে ইঞ্জিলকে গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল; পরে সেই অনুবাদকে আবার ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করতঃ তার নাম দেয়া হয়েছে বাইবেল। অতএব বাইবেলকে অনুবাদের অনুবাদ বলা হলেই ঠিক বলা হয়।

বর্তমানে বাংলা, উর্দু প্রভৃতি নানা ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ওসব যে বাইবেল নামক গ্রন্থের অনুবাদ নাম দেখে সেকথা বুঝতে পারা সম্ভব নয়। কেননা, বাংলা বাইবেলের নাম কোথাও 'ধর্মপুস্তক' আবার কোথাও 'সুসমাচার, উর্দু বাইবেলের নাম 'খোশখবরী' ইত্যাদি।

এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ব্যাকরণের চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী নাম বাচক বিশেষ্যের অন্যভাষায় অনুবাদ করা হয় না। বেদ, পুরাণ, ভাগবত, ত্রিপিটক, আবেস্তা প্রভৃতি প্রাচীনতম গ্রন্থসমূহের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু নামের বেলায় কোন পরিবর্তন ঘটানো হয় নি। অর্থাৎ নামটিকে সম্পূর্ণরূপে অক্ষুন্ন ও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এই নাম পরিবর্তন বা ভাষান্তরিত করণের ভীষণ একটা অসুবিধাও রয়েছে, উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে—

জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোকের নাম—আর্মষ্ট্রং। আমরা যদি এই নামটির বঙ্গানুবাদ 'দৃঢ়বাহু' ধরে নেই এবং দৃঢ়বাহু নামে আর্মষ্ট্রং-

www.pathagar.com

কে আহ্বান করি তবে কোন দিনই তার সাড়া পাবোনা, অথবা আমরা যদি গোটা পৃথিবীতে অভিযান চালিয়ে ইংরাজী ভাষাভাষী মানুষদিগের মধ্যে 'দৃঢ়বাহু' নামক কোন ব্যক্তির অনুসন্ধান করি তবে নিশ্চিত রূপেই এই নামধেয় কোন ব্যক্তির সন্ধান আমরা পাবোনা।

নামকরণের সাধারণ নিয়ম হলো নামটি বস্তুর এবং বস্তুটি নামের উপযোগী হতে হবে এবং নামটি অর্থপূর্ণ হতে হবে, যাতে নামটি শ্রুতিগোচর হওয়ার সাথে সাথে শ্রোতা বস্তুটি সম্পর্কে মোটা-মুটি একটা ধারণায় উপনীত হতে সক্ষম হয়। মনে রাখতে হবে যে, এক জাতীয় বহু জিনিসের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট একটিকে পৃথক করে নেয়াই ভিন্ন ভিন্ন নাম রাখার উদ্দেশ্য। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে 'কাঠালের আমসত্ত্ব' 'সোনার পাথরের বাটি' প্রভৃতি ধরনের নাম শুধু অর্থহীন এবং অবোধগম্যই নয়—ভীষণভাবে বিভ্রান্তিকরও।

বেদ, পুরাণ, ভাগবত, ত্রিপিটক প্রভৃতি সব গুলিই ধর্ম পুস্তক, প্রতিটি নামেরই ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য ভিন্ন ভিন্ন। এগুলোর নাম শ্রুতিগোচর হওয়ার সাথে সাথেই একটি থেকে অন্যটির পার্থক্য বুঝতে পারা যায়।

বলাবাহুল্য, ইঞ্জিল নামটিরও একটি ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য রয়েছে। আর এ নামটি স্বয়ং বিশ্ববিধাতার দেয়া নাম। এ নামের, পরিবর্তন ঘটানোর সামান্যতম যোগ্যতা এবং অধিকার কোন মানুষের থাকতে পারে না। অতএব 'ইঞ্জিল'-কে 'বাইবেল,' 'সুসমাচার' 'ধর্ম পুস্তক' 'খোশখবরী' প্রভৃতি নাম দিয়ে শুধু চরম বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করা হয় নি গ্রন্থটির ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য তথা মৌলিকতাকেও ভীষণভাবে ক্ষুন্ন করা হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন।

দু-একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সকল মহলের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে বলে আশা করি। উদাহরণ স্বরূপ 'ধর্মপুস্তক' এবং 'সুসমাচার' এ নাম দু'টিকে বেছে নেয়া যেতে পারে।

'ধর্মপুস্তক' বলতে পৃথিবীর সবগুলি অথবা যেকোন একটি ধর্ম পুস্তককে বুঝায়; বাইবেলকে পৃথকভাবে বুঝায় না। সুতরাং

www.pathagar.com

ধর্মপুস্তক নামকরণের দ্বারা প্রকৃত পক্ষে ইঞ্জিল শব্দের তাৎপর্যকেই ভীষণভাবে ব্যর্থ-ব্যাহত করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে 'সুসমাচার' বলতে একমাত্র বাইবেলকেই বুঝায় না—যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ, সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতি অন্য কথায় পৃথিবীর সুসমাচারবাহী সকল গ্রন্থকেই বুঝায়। সুতরাং এই নামকরণের দ্বারা ইঞ্জিলের তাৎপর্যকেই শুধু ব্যর্থ-ব্যহত করা হয় নি গ্রন্থখানা সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি করা হয়েছে।

তাছাড়া ইঞ্জিলে যীশুখ্রীষ্টের লাঞ্ছনা, অপমান, নির্যাতন, জনৈক ভক্ত কর্তৃক মাত্র ত্রিশটি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে যীশুকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দেয়া এবং শত্রু কর্তৃক যীশুকে ক্রুশে নিহতকরণ প্রভৃতি কু বা অতি দুঃখ জনক সমাচারও রয়েছে। অতএব এদিক দিয়ে বিচার করা হলে ইঞ্জিল বা বাইবেলের "সুসমাচার' নামকরণকে যথার্থ বলে ধরে নেয়া যায় না। তবে এই সুসমাচার নামকরণের অন্য একটি বিশেষ কারণ রয়েছে। সে কারণটি হলো ঃ

ইঞ্জিল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্যই হলো সুসমাচার বা সুসংবাদ। অসতর্ক অবস্থায় অথবা উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাইবেলের বাংলা সংস্করণে এই সুসমাচার নামটি তাঁরা ব্যবহার করেছেন বলে অনেকের বিশ্বাস।

বিশ্ববিধাতা কর্তৃক এই গ্রন্থের ইঞ্জিল নামকরণের তাৎপর্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা হলো যীশুখ্রীষ্টের পরবর্তী নবী (সঃ) যিনি যীশুখ্রীষ্টের প্রতি শত্রুদিগের আরোপিত মিথ্যা কলঙ্ক (যেমন তিনি জারজ, অভিশপ্ত, রাষ্ট্রদ্রোহী, ভণ্ড প্রভৃতি) থেকে তাঁকে মুক্ত করবেন সেই নবী (সঃ)-এর আবির্ভাবের সুসমাচার বা সুসংবাদটি এই গ্রন্থে রয়েছে বলেই এই গ্রন্থের নাম ইঞ্জিল বা সুসমাচার রাখা হয়েছে।

স্বার্থবাদী মহল ইঞ্জিল শব্দের এই তাৎপর্যকে চাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে শুধু ইঞ্জিল নামটিই নয় মূল গ্রন্থেরও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়েছেন বলে উপরোক্ত মহল বিশ্বাস পোষণ করেন, তাঁদের এই বিশ্বাসের পশ্চাতে বহু অকট্য প্রমাণ থাকারও দাবী তাঁরা করেন।

এ নিয়ে আর বিস্তারিত আলোচনায় যেতে চাইনা। কেননা, এই

www.pathagar.com

নাম পরিবর্তনের ফলে গ্রন্থখানার মৌলিকতা এবং বোধগম্যতাকে কত মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে সেকথা বুঝতে অনেক বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

দুঃখের বিষয় শুধু বিশ্ববিধাতা প্রদত্ত এই নামটিকেই নয়—স্বয়ং বিশ্ববিধাতা এবং তিনি যাঁর মাধ্যমে এই গ্রন্থখানা অবতীর্ণ করেছিলেন এই উভয় নামেরও যথেচ্ছ পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ গড্ এবং জিজাস বা জিসাস (বাংলা ভাষায় যীশু) এই নাম দ্বয়কে বেছে নেয়া যেতে পারে। বাইবেলের বর্ণনায় প্রকাশঃ যীশুখ্রীষ্টকে যখন ক্রুশ বিদ্ধ করতঃ হত্যা করা হয় তখন তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন—"এলি! এলি! লামা সাবক্তনী"। অর্থাৎ হে আমার এলি, হে আমার এলি! তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিলে?

উল্লেখ্য যে, সুরিয়ানী ভাষায় 'এলি' শব্দের অর্থ হলো—আমার প্রভু"। অতএব মূল ইঞ্জিলে বিশ্ববিধাতার নাম যে 'এলি' বলে লিখিত ছিল অনায়াসে সেকথা বুঝতে পারা যাচ্ছে।

অথচ ইংরাজী বাইবেলে এই নামটিকে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী "গড্" বানানো হয়েছে, আবার বেদ ও পুরাণের ঈশ্বর শব্দটিকে টেনে এনে বাংলা বাইবেল বা ধর্মপুস্তক ও সুসমাচারে জুড়ে দেয়া হয়েছে।

অনরূপভাবে সুরিয়ানী ভাষায় ইঞ্জিল বর্ণিত—'ঈশা' শব্দটির পরিবর্তন ঘটিয়ে ইংরাজী ভাষায় জিজাস বা জিসাস্ এবং বাংলা ভাষায় 'যীশু' করা হয়েছে।

মোটকথা, এমনি ভাবে স্বয়ং বিশ্ববিধাতা, তাঁর প্রেরিত বার্তা-বাহক এবং তাঁর দেয়া গ্রন্থখানা—অর্থাৎ যে তিনটি ছাড়া রিলিজিয়নের কল্পনাই করা যেতে পারে না যদৃচ্ছভাবে সেই তিনটিরই নাম পরিবর্তন করতঃ এক নিদারুণ—বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে।

শুধু তা-ই নয়—বাইবেল নামক গ্রন্থখানাকেও যে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন পরিবর্ধন ও সংশোধন সংযোজনের দ্বারা 'দশ নকলে আসল খাস্তায়' পরিণত করা হয়েছে তার জাজ্বল্যমান বহু প্রমাণ বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়।

www.pathagar.com

আগ্রহী পাঠকবর্গের কেউ প্রয়োজন বোধ করলে মুনশী মেহের উল্লাহ্‌র লিখিত "রদ্দে খ্রীষ্টীয়ান," ডাঃ আহসানুজ্জামান লিখিত "পোল সমাচার বা বাইবেল পরিচিতি" মওলানা আকরম খাঁ লিখিত মোস্তফা-চরিতের "ইতিহাস ভাগ" মওলানা মওদুদী (রঃ) লিখিত তাফহীমুল কোরআন (২৮ পারা) এবং এই দীন লেখকের "আমি কেন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলাম না' প্রভৃতি পুস্তকগুলির যে-কোন একখানা পাঠ করতে পারেন।

পূর্বে বলা হয়েছে ঃ ব্যাকরণের চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী কোন নাম-বাচক বিশেষ্যের অনুবাদ বা ভাষান্তর করা হয় না। অথচ সেই চিরাচরিত নিয়মকে লংঘন করতঃ এমন তিনটি নামের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে যে, তিনটি ছাড়া রিলিজিয়নের কল্পনাই করা যেতে পারেনা।

তাছাড়া বিশ্বের প্রতিটি ভাষারই এমন কিছু নিজস্ব শব্দ থাকে অন্য কোন ভাষায় যার হুবহু প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না, অগত্যা জোড়া তালি দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে হয়। বাইবেলে এমনি ধরনের বহু জোড়া তালিই বিদ্যমান রয়েছে।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, রিলিজিয়ন শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য নির্ণয় আমাদের লক্ষ্য। অথচ এই শব্দটি মূলগ্রন্থের শব্দ নয়। মূল গ্রন্থটিও বহু পূর্বে ধরা পৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। ইঞ্জিলের ইংরাজী অনুবাদ অর্থাৎ বাইবেল থেকেও এই তাৎপর্য নির্ণয় সম্ভব হতে পারেনা। কেননা, একেতো তা মূল গ্রন্থের যথার্থ অনুবাদ নয়, তদুপরী ব্যাকরণের নীতি নিয়ম লংঘন করতঃ যথেচ্ছভাবে নাম-বাচক বিশেষ্যসহ গুরুত্বপূর্ণ বহু শব্দের মনগড়া প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

বাইবেলের সাথে যাদের পরিচয় রয়েছে তাঁরা অবশ্যই জানেন যে, পুনঃ পুনঃ সংশোধন, সংযোজন এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পরে বর্তমানে বাইবেল নামক যে গ্রন্থটি আমাদের সম্মুখে রয়েছে তা মূল গ্রন্থ বা ইন্জিলের এক অতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

যেহেতু খোদ রিলিজিয়ন শব্দটিই মূল গ্রন্থের শব্দ নয়—অন্য শব্দের অনুবাদ মাত্র; অতএব তার ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্যের অনুসন্ধান কোনক্রমেই ফলপ্রসূ হতে পারে না।

www.pathagar.com

উপসংহার

দীন ও আদ্-দীন সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, বিষয়টি খুবই সূক্ষ্ম এবং জটিল। সাধারণ মানুষ-দিগের পক্ষে প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করা বেশ কিছুটা কঠিন হতে পারে। কতিপয় উদাহরণ দিলে বিষয়টি তাঁদের কাছে সহজতর হয়ে উঠবে বলে আশা করি।

মোটামুটিভাবে দীন বলতে রাজা-বাদশাহ, ধর্মগুরু, নেতা, রাষ্ট্রশক্তি, পূর্বপুরুষ প্রভৃতির রচিত আইন বা জীবন-বিধান, এবং পুরুষানুক্রমে চলে আসা প্রাণ ও প্রজ্ঞাহীন আচারানুষ্ঠান এবং প্রথা-পদ্ধতিকে বুঝায়।

পক্ষান্তরে বিশ্ববাসীর জন্য বিশ্ববিধাতার দেয়া আইন বা জীবন বিধানকে বলা হয় আদ্-দীন। সহজ কথায় একটি মানব-রচিত আইন বা জীবন-বিধান যার ব্যাপ্তি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা রেখা এবং নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী, আর অন্যটি বিশ্ববাসীর জন্য বিশ্ব-বিধাতা প্রদত্ত আইন বা জীবনবিধান—যা সার্বজনীন, সর্বকালীন, নির্ভুল, নিরপেক্ষ এবং বিশ্বপ্রকৃতির সাথে সর্বতোভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এখানে এ কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, যে-বিধাতা একটি মাত্র প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা আবহমান কাল যাবত ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে এবং ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে সৃষ্ট জীব-জড়, ভূচর-খেচর নির্বিশেষে কোটি কোটি সৃষ্টিকে এমন সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে পরিচালিত করতে সক্ষম তিনি একই উপাদানে এবং একই উদ্দেশ্যে সৃষ্ট মানব জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন এতগুলি দীন বা ধর্মের সৃষ্টি করতঃ চিরকালের জন্য মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, ঘৃণা-বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-কলহের পথ খুলে দেবেন এটা কোনক্রমেই সম্ভব এবং যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারেনা। অতএব প্রাকৃতিক বিধানের মতো মানুষের জন্য তাঁর দেয়া জীবনবিধানও একটি হওয়াই স্বাভাবিক এবং যুক্তিসম্মত।

বিশ্ব প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করা হলেই দীন এবং আদ্-দীনের পার্থক্য নির্ণয় সহজ হবে বলে আশা করি। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে দিন-রাত, সাদা-কালো, আলো-আঁধার সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য,

www.pathagar.com

প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। এদের একটির জন্য অন্যটির অস্তিত্ব অপরিহার্য। উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে ঃ

রাত না থাকলে দিনের, আঁধার না থাকলে আলোর, দুঃখ না থাকলে সুখের মর্যাদা আমরা উপলব্ধি করতে পারতাম না। দুঃখ আছে বলেই সুখের জন্য মানুষ পাগলপারা হয়, সুখের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, সুখের জন্য জীবনপাত করতেও দ্বিধাবোধ করে না। বিশ্বপ্রকৃতিতে এই পরস্পর বিরোধী অবস্থা আবহমান কাল ধরেই আছে এবং চিরদিনই থাকবে। অতএব এটাকে সনাতন এবং চিরন্তনও বলা যেতে পারে।

দীন এবং আদ্‌দীনের বেলায়ও এই একই অবস্থা বিরাজমান। একটি মানব-রচিত বা মানবীয় কল্পনা-প্রসূত আর অন্যটি বিশ্ব-বিধাতার পক্ষ থেকে অবতারিত।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, আবহমান কাল ধরে এ দুটি বিধানই চালু রয়েছে। বিশ্ববিধাতা প্রদত্ত দীন (আদ্‌দীন) সম্পর্কে যাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁরা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন যে দীন যে মানব-রচিত আইন এবং তা যে নির্ভুল নিরপেক্ষ এবং কল্যাণ দায়ক হতে পারেনা আবহমান কাল ধরে আদ্‌-দীন নানাভাবে নানা ভঙ্গিতে এবং বিভিন্ন ধরনের উপমা-উদাহরণের সাহায্যে বিশ্ববাসীর কাছে সেকথাই তুলে ধরছে এবং সর্বতোভাবে আদ্‌-দীনকে গ্রহণ করার প্রেরণা, উৎসাহ ও পথ-নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে।

বিষয়টিকে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে বোধগম্য করে তোলার জন্য দুটি মাত্র উদাহরণই যথেষ্ট হবে বলে আশা করি। তবে উদাহরণ দুটি তুলে ধরার পূর্বে নাতিদীর্ঘ পটভূমিকার প্রয়োজন রয়েছে উক্ত পটভূমিকা হলো ঃ

আমরা জানি, মানুষ সৃষ্টির সেরা হলেও বিশেষ কারণে গোটা সৃষ্টির মধ্যে মানুষকেই সর্বাধিক দুর্বল ও সর্বাধিক অসহায় করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

হাজার হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীতে বিচরণশীল আদি মানবদিগের অবস্থা কত করুণ ও অসহায় ছিল সেকথা ভাবতেও আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে।

www.pathagar.com

রাতের সূচীভেদ্য অন্ধকার, আলো ও আশ্রয়ের অভাব, হিংস্র ও রক্ত লুলুপ শ্বাপদের হুংকার প্রভৃতির মধ্যে ভীত, সন্ত্রস্থ ও দিশাহারা আদি মানবেরা চন্দ্র ও সূর্যের আবির্ভাবকে গোটা অন্তর দিয়ে স্বাগতম জানিয়েছে: ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় তাদের উদ্দেশ্যে মস্তক অবনত করেছে এবং তাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বিভিন্ন উপায় উপকরণ এবং প্রথা ও পদ্ধতির উদ্ভাবণ করেছে।

অনুরূপভাবে ভয়াবহ রাত্রি এবং আনন্দ দায়ক দিনকেও ভয় ও ভক্তির আতিশয্যে তারা উপাস্যে পরিণত করে নিয়েছে।

আমরা জানি, অনুসন্ধিৎসা মানুষের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি। এই বৃত্তিই অজানাকে জানার এবং অচেনাকে চেনার প্রেরণা সৃষ্টি করে উৎসাহ যোগায়। অনুসন্ধিৎসু হওয়ার কারণে মানুষ চিন্তাশীল এবং কল্পনা প্রবণও।

কোন কিছু চোখে পড়ার সাথে সাথে তার পরিচয় জানার অনুসন্ধিৎসা তাকে চঞ্চল করে তোলে এবং চিন্তান্বিত করে। সেই কোন কিছুর প্রকৃত পরিচয় জানা যদি তার সাধ্যাতীত হয় তথাপি সে নিশ্চেষ্ট বা নিবৃত হয় না; নিজ যোগ্যতানুযায়ী কল্পনার সাহায্যে তার একটা পরিচয় সাব্যস্থ করে নেয়।

আদি মানবেরাও কল্পনার সাহায্যে দিন, রাত, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতির এক একটা পরিচয় সাব্যস্থ করে নিয়েছিল। এখানে আমরা আলোচনা সংক্ষেপ করার জন্য সূর্যের পরিচয় সম্পর্কীয় তাদের কয়েকটি মাত্র ধারণার কথা তুলে ধরবো।

ক) কশ্যপ নামক মুনির ঔরসে এবং তদীয় পত্নী অদিতির গর্ভে সূর্যের জন্ম হয়েছে। সেই কারণে সূর্যের এক নাম কাশ্যপ এবং অন্য নাম আদিত্য।

খ) সূর্য সকল প্রকারের পাপ হননকারী। অর্থাৎ সূর্য ভক্তেরা যত পাপই করুণ সূর্যের কৃপায় তা নস্যাৎ হয়ে যায়।

উল্লেখ্য ঃ পরবর্তী বংশধরগণ সূর্য প্রণামের যে মন্ত্র রচনা করেছেন এবং অদ্যাপি যা পঠিত হয়ে চলেছে সে মন্ত্রটি হলো ঃ

ওঁ জবা কুসুম সংকাশং কাশ্য পেয়ং মহাদ্যুতিম
ধ্যান্তারীং সর্বপাপঘ্নং প্রণোতস্মী দিবাকরম্।

www.pathagar.com

অর্থাৎ-জবা ফুলের মত আভাযুক্ত, কশ্যাপ মুনির পুত্র মহাদ্যুতিময় এবং সর্বপাপ হননকারী দিবাকর (সূর্য)-এর ধ্যান ও প্রণাম করিতেছি। —পুরোহিত দর্পণ

গ) সূর্য সাত ঘোড়ার রথে আরোহণ করতঃ ভূমণ্ডল প্রদর্শন করেন ফলে দিনরাত্রি সংঘটিত হয়। সূর্যের স্ত্রীর নাম উষা।-ঋগ্বেদ

ঘ) কুন্তী কুমারী অবস্থায় একটি মন্ত্রের শক্তি পরীক্ষা করেন, ফলে তথায় সূর্যের আবির্ভাব ঘটে। কুন্তীর সাথে সূর্য মিলিত হয়। এই মিলনের ফলে কন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম হয়। ইত্যাদি।-মহাভারত

উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সূর্য সম্পর্কে এরূপ নানা ধারণা বিদ্যমান ছিল আজও কোন কোন দেশে এসব ধারণা বিদ্যমান রয়েছে।

বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এসব ধারণা-বিশ্বাস পোষণের জন্য আদি মানবদিগকে দোষী সাব্যস্ত করা হলে প্রচণ্ড ভুল করা হবে, কেননা তৎকালে সূর্যের আসল পরিচয় জানার মতো জ্ঞানবুদ্ধি এবং উপায় উপকরণ তাদের ছিলনা।

বরং সেই গভীর অন্ধকার যুগের মানুষ হয়েও তারা যে সত্য নির্ধারণের জন্য তাদের সাধ্য শক্তি অনুযায়ী চিন্তা গবেষণা করেছেন অন্য কথায় চিন্তা গবেষণার সূত্রপাত করতঃ জাতির জন্য উন্নতি অগ্রগতির ধাপ রচনা করে গিয়েছেন সেজন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত।

চিন্তা গবেষণা করলে দেখা যাবে যে, এ ব্যাপারে আসল দোষী আমরাই। কেননা সূর্য যে, পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় তের লক্ষ গুণ বড়, এবং পৃথিবী থেকে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত, একটা ভীষণ ধরণের আগ্নেয়গোলক এসব কথা সুনিশ্চিত রূপে জানার পর আজও আমরা তাকে কাশ্যপ ও আদিত্য নামে অভিহিত করি, সর্ব পাপঘ্ন বলে পূজা প্রণিপাত করি, কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্মদাতা বলে বিশ্বাস করি, হনুমান তাকে বগল দাবা করেছিল বলে হনুমানের প্রশংসা করি।

ইসলামী পরিভাষায় মানব-রচিত এ ধরণের কল্প-কাহিনী সম্বলিত বিধানকেই দীন বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে এই ভুলের প্রতিবাদ করতঃ আবহমান কাল ধরে আদ্‌দীন ঘোষণা করে এসেছে ঃ

রাত্রি, দিন, সূর্য ও চন্দ্র আমারই নিদর্শন (অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব শক্তিমত্তা, অঘটন ঘটনপটিয়সী ক্ষমতা সৃষ্টি সৌকর্য, প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্ব প্রভৃতি)। তোমরা সূর্য ও চন্দ্রের উপাসনা করিওনা— একমাত্র আমারই উপাসনা কর কেননা এই উভয়কে আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। —আল কোরআন

অনেকেই অবগত আছেন যে, এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, পুতুল, প্রতিমা, দেশের শাসনকর্তা প্রভৃতির পূজা, প্রভুত্বের প্রতিবাদ অন্য কথায় প্রচলিত দীনের পরিবর্তে আদ্‌দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে চরমভাবে লাঞ্ছিত এমন কি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হতে হয়েছিল।

দীন ও আদ্‌দীন সম্পর্কে আমাদের দ্বিতীয় উদাহরণটি হলো ঃ আদি মানবেরা কল্পনা করতঃ এই ভূমণ্ডলের নাম রেখে ছিলো পৃথিবী, মেদিনী, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি। বলাবাহুল্য, এই ভিন্ন ভিন্ন নামকরণের ভিন্ন ভিন্ন কারণও তারা কল্পনা করে নিয়েছিল। সেই কারণগুলি হলো ঃ

পৃথিবী ঃ বেন নামক জনৈক অপুত্রক রাজা পুত্র লাভের আশায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। আহূত কতিপয় মুনি মন্ত্র পাঠের সাথে সাথে বেন রাজার হস্ত মন্থন করতে থাকেন, ফলে একপুত্র সন্তান সৃষ্ট হয়, তার নাম রাখা হয় পৃথু। কালক্রমে এই পৃথু গোটা ভূমণ্ডলের রাজা হন, সেই কারণে এই ভু-মণ্ডলের নাম হয়— পৃথিবী।

মেদিনী ঃ ভগবানের কর্ণমল থেকে-শম্ভু ও নিশম্ভু নামক দুই দৈত্যের উদ্ভব ঘটে তারা উভয়ে ভগবানকে আক্রমণ করে এবং ভগবানের হাতে নিহত হয়। এই উভয়ের "মেদ" বা চর্বি দ্বারা এই ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি হয় বলে তার নাম রাখা হয়—মেদিনী।

ব্রহ্মাণ্ড ঃ কারণ-বারিতে সৃষ্টিবীজ নিক্ষিপ্ত হলে একটি ডিম বা অণ্ড সৃষ্টি হয়। কালক্রমে উক্ত অণ্ড দ্বিখণ্ডিত হয়—অণ্ড থেকে ব্রহ্মানির্গত হন। অণ্ডের একভাগ আকাশ এবং অন্যভাগ পৃথিবীতে

www.pathagar.com

পরিণত হয়। অণ্ড থেকে ব্রহ্মা নির্গত হন বলেই এই ভূমণ্ডলের নাম রাখা হয়—ব্রহ্মাণ্ড।

—আশুতোষ দেবের নতুন বাঙ্গালা অভিঃ দ্রঃ

পক্ষান্তরে আদ্-দীনের পরিভাষায় এই ভূমণ্ডলের নাম—হলো 'আলম'। আলম নামকরণের হেতু সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

এক সময়ে বিশ্ব নিখিল বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিলনা; স্রষ্টা একাকী বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা হলো তিনি প্রকাশিত হবেন। অর্থাৎ এমন কিছু সৃষ্টি করবেন যদ্বারা তিনি নিজেকে ব্যক্ত বা প্রকাশিত করতে পারেন আর সৃষ্টেরাও তাঁকে জানতে সক্ষম হয়।

তাঁর ইচ্ছা বা নির্দেশমাত্র বিশ্বনিখিল সৃষ্টি হলো এবং তার নাম রাখা হলো—'আলম'। আর আলম শব্দের তাৎপর্য হলো—যদ্বারা স্রষ্টাকে জানা যায়।

আশাকরি, এ দুটি মাত্র উদাহরণ থেকেই দীন ও আদ্-দীন শব্দের পার্থক্য বুঝতে পারা যাবে। পরিশেষে আর একটি মাত্র বিষয়ের প্রতি সংক্ষেপে আলোকপাত করেই পুস্তকের ইতি টানছি।

প্রাচীনত্ব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শত্রুর নাশকতা, অল্পজ্ঞ ও ভক্ত-ভাবুকদিগের ব্যাখ্যা-ভাষ্য, স্বার্থপরদিগের কারসাজি প্রভৃতি কারণে অতীতের দীন সম্পর্কীয় বিধানসমূহের প্রায় সবগুলিই আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, অতিরঞ্জিত, পরিবর্তিত, অথবা যুগের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে।

আদ্-দীন সম্পর্কীয় বিধানসমূহের প্রায় সবগুলির বেলায়ও এই একই কথা প্রযোজ্য। অতএব সেগুলিও আর যথাযোগ্য ভূমিকা পালনে সক্ষম নয়। এ সম্পর্কে একটি মাত্র উদাহরণই যথেষ্ট হবে বলে আশা করি।

ইঞ্জিল যে, বিশ্ববিধাতা কর্তৃক অবতীর্ণ সেকথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। অতএব তা যে আদ্-দীন সম্পর্কীয় বিধান সে-সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই, কিন্তু মানবীয় হস্তক্ষেপের কারণে তার মৌলিকতা বা স্বকীয় মাহাত্ম ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। যথা ঃ আদি পুস্তক (ইঞ্জিলের বাংলা সংস্করণ) ৩২ অঃ ২২-৩০ পদে ইসরাইল সম্পর্কে যে-কথা বলা হয়েছে তার সারমর্ম হলো ঃ

www.pathagar.com

সদাপ্রভু এক রাত্রিতে যাকোবকে একাকী পাইয়া তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন. সদাপ্রভু তখন নরাকার ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যাকোবকে কোন মতেই আঁটিয়া উঠিতে না পারায় তাঁহার 'শ্রেণীফলকে' আঘাত করেন। ফলে তাঁহার উরুর হাড় স্থানচ্যুত হয়। তখন তিনি (পুরুষরূপী সদাপ্রভু) বলেন "আমাকে ছাড় কেননা প্রভাত হইতেছে"। কিন্তু যাকোব তাঁহাকে ছাড়লেন না বরং দৃঢ়তার সাথে বলিলেন—আপনি আমাকে আশীর্বাদ না করিলে আমি আপনাকে ছাড়িব না। অগত্যা সদাপ্রভু যাকোবকে আশীর্বাদ করেন এবং বলেন ঃ এখন হইতে তুমি আর যাকোব বা প্রবঞ্চক নামে অভিহিত হইবে না. এখন হইতে তুমি ইসরাইল নামে খ্যাত হইবে। কেননা তুমি ঈশ্বর ও মানুষদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ, ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী ইসহাক নবী (সঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র পিতা ইসহাক এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এষৌকে প্রতারিত করিয়া ঈশ্বরের অশীর্বাদ এবং ভ্রাতার জ্যেষ্ঠত্ব অধিকার করেন সেই কারণেই তাঁর নাম হয় —যাকোব বা প্রবঞ্চক।

পরে ঈশ্বর বা সদাপ্রভুর সাথে মল্লযুদ্ধ করতঃ কিভাবে যাকোব নামের পরিবর্তে ইসরাইল বা ঈশ্বরের সাথে যুদ্ধকারী নাম প্রাপ্ত হন তার বিবরণ তো উপরের উদ্ধৃতি থেকেই জানতে পারা গেল।

এরূপ উদ্ভট, অযৌক্তিক এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কাহিনীর সাথে যে আদ্-দীনের সামান্যতম সম্পর্কও থাকতে পারেনা সেকথা বুঝতে অনেক বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো ঃ অনেক বিদ্যা-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও যেন ইচ্ছা করেই এসব বুঝতে চান না।

সেই গুহা-জীবনের উলঙ্গ থাকা, কাঁচা মাংস খাওয়া, ইশারা ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ, পাথরের অস্ত্র ব্যবহার, যাযাবর বৃত্তি প্রভৃতি অন্য কথায় আদিম জামানার সব কিছুকে বর্বরযুগীয় কার্য-কলাপ বলে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ এবং নিজদিগকে সভ্য, শিক্ষিত, জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, প্রগতিশীল প্রভৃতি বলে গর্বের সাথে দাবী করলেও দীন বা ধর্মীয় বিশ্বাস এবং কার্যকলাপের বেলায় তাঁরা গুহাজীবনেই

www.pathagar.com

পড়ে রয়েছেন এবং সেটাকেই ধার্মিকতার পরাকাষ্ঠা বলে গর্বের সাথে ঘোষণাও করছেন।

পরিশেষে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র প্রভৃতি নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের কাছে একটি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করছি। তবে প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন যে,—দীন (ধর্ম) ও আদ্-দীন একান্ত রূপেই বিশ্বাসের বিষয়, আর বিশ্বাস হলো একান্ত রূপেই মনের কাজ। মনের উপরে জোর করে চাপিয়ে দেয়া বিশ্বাসকে মোনাফেকী বা কপট বিশ্বাস এবং বিনা বিচার বিবেচনায় পুরুষানুক্রমিকভাবে চালিয়ে যাওয়া বিশ্বাসকে অন্ধবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারেনা। একমাত্র অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাসকেই সরল বা আসল বিশ্বাস বলা যেতে পারে।

আমরা জানি এবং ভালভাবেই জানি যে, কোন কিছুকে না জানা পর্যন্ত তার প্রতি বিশ্বাস বা অবিশ্বাস সৃষ্টি হতে পারেনা। যাকে যত বেশী জানা যায় তার প্রতি বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের মাত্রা এবং পরিমাণও তত বেশী হয়ে থাকে।

জীবনের প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি মনন, প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ এবং ইহ-পরকালের সাথে যে দীন (ধর্ম) বা আদ্-দীনের সম্পর্ক গভীর ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত তার সম্পর্কে অজ্ঞতা, উদাসীনতা এবং মৌখিক বিশ্বাস পোষণের দাবী শুধু অন্যায়, অসঙ্গত এবং প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিকরই নয়—চরম কপটতারও পরিচায়ক।

অতএব, সনির্বন্ধ অনুরোধ—আপনারা বিশ্বের দীন (ধর্ম) ও আদ্-দীন সম্পর্কীয় বিধি বিধানসমূহ নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা পর্যালোচনা করুন এবং প্রকৃত সত্যকে জানার মাধ্যমে অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাস সৃষ্টির পথকে সহজ ও সুগম করুন।

আমরা দৃঢ় কণ্ঠে এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে পারি যে, যিনিই একনিষ্ঠ, সত্যানুসন্ধিৎসু ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে এ কাজ করবেন তিনি অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, বিশ্বের দীন (ধর্ম) ও আদ্-দীন সম্পর্কীয় অতীতের বিধানসমূহের সবগুলিই নানা কারণে ক্ষুন্ন, ক্ষতিগ্রস্থ এবং ভেজালে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। তাছাড়া ওগুলোর শিক্ষাও সার্বজনীন, সর্বকালীন, পূর্ণাঙ্গ এবং যুগোপযোগী নয়।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে তাঁরা দেখতে পাবেন যে, যে-বিধানটি নির্ভুল, নিরপেক্ষ সার্বজনীন, সর্বকালীন, পূর্ণাঙ্গ এবং যুগোপযোগী শিক্ষা নিয়ে সম্পূর্ণ অক্ষত ও অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে এবং থাকবে সে বিধানটির নাম—আল-কোরআন।

বিশ্বপ্রভু বিশ্ববাসীকে দীন ও আদ্-দীনের পার্থক্য উপলব্ধি করার এবং প্রকৃত সত্যকে সর্বতোভাবে আঁকড়ে ধরার সুযোগ ও সৌভাগ্য দান করুন কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনাই করি। আমিন!

সমাপ্ত

www.pathagar.com